THE DHAKA UNIVERSITY JOURNAL OF LINGUISTICS
@2025 Department of Linguistics
Vol. 18, No. 35, June 2025, P. 31-62
ISSN : 2789-3014, eISSN : 2075-3098
http://dx.doi.org/10.70438/dujl/1835/0002

নজরুলের *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের লোকভাষা বিশ্লেষণ

তাশরিক-ই-হাবিব*

Abstract: The novel *Mrityukhudha* is Kazi Nazrul Islam's one of best literary works. In the novel, written against the backdrop of Krishnanagar, a city in the West Bengal province of colonial India, the author consciously expresses his own literary and political views and positions. In addition to the intense desire for liberation of the masses of subjugated India, he also authentically highlights the socio-cultural characteristics of the marginalized population within the civil sphere here. Although the novel is written in a narrative style in light of contemporary life realities, its artistic quality and human appeal are undoubtedly outstanding. Although researchers and critics have given due importance to the content in their evaluation, the task of exploring its relevance in folk cultural standards has not been done with due significance. That is why the present article attempts to study it based on folk language. We expect that this will further expand the opportunities for understanding the literary qualities of the folk language used by the marginalized communities of Krishnanagar. The present article analyzes the use of folk language in Nazrul's novel *Mrityukhudha* in the light of the interrelationship between sociolinguistics and folk language.

Keywords: *Mrityukhudha,* Kazi Nazrul Islam, folk language, sociolinguistics

১. ভূমিকা

মৃত্যুক্ষুধা[১] (১৯৩০) উপন্যাসটি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) কথাসাহিত্য চর্চার অন্যতম প্রতিনিধিত্বমূলক দৃষ্টান্ত। কবি ও গীতিকার হিসেবে অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী নজরুলের গদ্যশিল্প সৃজনের প্রথম অবলম্বন ছিল ছোটগল্প।[২] এর পাশাপাশি উপন্যাস লিখেও তিনি সৃজনশীল গদ্যচর্চায় তাঁর সৃষ্টিকুশলতা তুলে ধরেন, যার অনবদ্য প্রয়াস *মৃত্যুক্ষুধা*[৩]। তিনটি উপন্যাস ও আঠারোটি ছোটগল্প লিখে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে স্বকীয় সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে এ উপন্যাসটি আধার ও আধেয় উভয় বিবেচনায় ব্যতিক্রমধর্মী।[৪] বিশেষত, নগরজীবনের কায়িক শ্রমজীবী

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। E-mail : tashrikdu.bangla@gmail.com

বাসিন্দাদের জীবনপ্রবাহের অকপট চালচিত্র রূপায়ণের যে প্রয়াস 'কল্লোলযুগের কথাশিল্পী'দের[৫] লেখায় ফুটে ওঠে, এর সঙ্গে নজরুলের বর্তমান উপন্যাসটির বিষয়বস্তু নির্বাচনে[৬] সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের দালিলিক বৃত্তান্ত উপস্থাপনের তাগিদে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের গণমানুষের জীবনসংগ্রাম ও প্রাত্যহিকতার চালচিত্র[৭] এতে পরিশীলিত ও বিশ্বাসযোগ্য শিল্পভাষ্যে উন্নীত হয়েছে। এর সবিশেষ কারণ হল, নজরুল নিজেও তাদের মতই জীবনের প্রারম্ভভাগ থেকেই দারিদ্র্য -অনটনের সঙ্গে জীবনযুদ্ধ[৮] করেছেন, পরবর্তীকালে তাদের পাশে থেকেছেন বিভিন্নভাবে। সেকারণেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন[৯]— গণমানুষের উন্নতি অর্জনের জন্য ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি অর্জনের বিকল্প ভারতবাসীর নেই। কৃষ্ণনগরে বাসকালে[১০] তিনি *মৃত্যুক্ষুধা* লিখতে অনুপ্রাণিত হন। এ উপন্যাসে প্রতিফলিত তাঁর সংগ্রামী জীবনাভিজ্ঞতা ও সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণস্নাত উপলব্ধি শ্রেণি-বর্ণ-জাত-পাত-সম্প্রদায়ে বিভাজিত ভারতবর্ষের[১১] গণমানুষের ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক চালচিত্রকে জোরালো ভাষ্যরূপ দিয়েছে। চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী, শাসনকাঠামোভুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামাজিক প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের[১২] উপনিবেশিত বাসিন্দাদের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ চালচিত্রের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে গণমানুষের জীবনচর্যা গ্রন্থনায় তিনি সম্যক গুরুত্ব দিয়েছেন। কৃষ্ণনগরের সামাজিক পরিধিবৃত্তের তলদেশে অবস্থানরত প্রান্তিক[১৩] বাসিন্দাদের লোকসাংস্কৃতিক চালচিত্রের বয়ান এ উপন্যাসে স্বকীয় মাত্রায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিকের সচেতন অভিনিবেশ, গণমানুষের প্রতি আস্থা ও একাত্মতাবোধ, সর্বোপরি তাদের জীবনধারার উন্নতি সাধনের সুদৃঢ় প্রত্যয়কে সৃষ্টিশীলতায় উত্তরণের সামর্থ্যগুণে উপন্যাসটি কালজয়ী মর্যাদায় আসীন।

২. গবেষণা পদ্ধতি

২.১ *গবেষণার যৌক্তিকতা*

বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিশীলতার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনস্বরূপ অবিভক্ত বাংলার বহুবর্ণিল লোকসংস্কৃতিসমৃদ্ধ *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসটি প্রতিনিধিস্থানীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। লোকসংস্কৃতির[১৪] অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান[১৫] হল লোকভাষা।[১৬] লোকগোষ্ঠীভুক্ত বাসিন্দাদের সামষ্টিক ভাবনা, আবেগ, আচরণ, মানসিকতা ও জীবনোপলব্ধির বৈচিত্র্যময় বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রাত্যহিক জীবনে তাদের অবলম্বিত ভাষার আশ্রয়ে। মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেই শুধু নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিভিন্ন দ্যোতনা, ইশারা, অভিব্যক্তি ও সংবেদনার সহজাত উন্মোচনে লোকভাষা হয়ে ওঠে লোকসমাজের বাসিন্দাদের প্রধান অবলম্বন।

মৌখিকরূপে প্রচলিত, সমষ্টিজনের নিকট অনুসৃত এবং পূর্বসূরীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধায় এর ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত উত্তরাধিকার কালিক পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে গ্রহণ-বর্জনের ধারাবাহিকতায় সমকালে টিকে থাকে। বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীভুক্ত বাসিন্দাদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সংঘটিত রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড, সামাজিক ঘটনাসমূহ, শাসনব্যবস্থার ঐতিহাসিক পালাবদল, আইন-বিচার ও প্রশাসনকাঠামো, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশাসন প্রভৃতির অভিঘাত পরিলক্ষিত হয়। অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর, বৈজ্ঞানিক ভাবনা ও আধুনিক জীবনবোধ থেকে দূরবর্তী, নিয়তিনির্ভর ও প্রায় অশিক্ষিত-নিরক্ষর লোকসমাজের বাসিন্দাদের বিশ্বাস-সংস্কার-রীতি-নীতিগত পরিসর বহুলাংশেই তাদের নিজস্ব ভাষিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকেন্দ্রিক। তাই কৃষ্ণনগরের নাগরিক লোকসংস্কৃতির[১৭] প্রতিনিধি হিসেবে এখানকার কায়িক শ্রমজীবী বাসিন্দাদের জীবনভাবনা, জীবিকানির্বাহরীতি, লোকসংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক অনুষঙ্গের উল্লেখযোগ্য দিকগুলোকে বর্তমান প্রবন্ধে লোকভাষিক পরিমণ্ডলে আলোচনাভুক্ত করা হয়েছে। এ উপন্যাসে কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক সমাজের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক দিনযাপন, জীবিকানির্ভরতা ও অভিজ্ঞতাসঞ্জাত কথামালায় বাঙ্ময় হয়েছে নাগরিক লোকসংস্কৃতি-সন্নিহিত বিবিধ প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে এতদঞ্চলের লোকভাষা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নজরুলের সমকালে তাঁর সহযাত্রী কথাশিল্পীরা, বিশেষত 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকেরা কলকাতা মহানগর ও এর পার্শ্ববর্তী শহর-শহরতলি-মফস্বলের পটভূমিতে বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু বাংলার নাগরিক লোকসংস্কৃতির রূপায়ণে তাঁরা বিশ্বস্ত শিল্পসামর্থ্যের পরিচয় দিতে পারেননি। মাটিঘেঁষা, কায়িক শ্রমক্লিষ্ট বাংলার মেহনতি জনতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ছিল নজরুলের সাহিত্যচর্চার অন্যতম অবলম্বন। তাই এ উপন্যাসে তিনি তাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রচলিত ভাষারীতি ও বাকবিন্যাস, মৌখিক লোকসাহিত্যের প্রতি সম্যক অভিনিবেশ ও গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোনো গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়নি। সেকারণেই বর্তমান প্রবন্ধে আমরা *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে প্রযুক্ত লোকভাষার প্রায়োগিক বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছি।

২.২. *গবেষণা কৌশল*

যেহেতু বর্তমান গবেষণাকর্মের উপাদানসমূহ বাস্তব জীবনে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসরের অন্তর্গত বাসিন্দাদের দ্বারা ব্যবহৃত লোকভাষাভিত্তিক নয়, বরং নজরুলের *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে প্রযুক্ত লোকভাষাকেন্দ্রিক, তাই এক্ষেত্রে আমরা এতদ্বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্য সমন্বয়ের পাশাপাশি বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছি। এক্ষেত্রে আমরা ফোকলোরকেন্দ্রিক গবেষণারীতির সঙ্গে সমাজভাষাবিজ্ঞানের কৌশলগত সমন্বয় ঘটিয়ে লোকভাষার প্রাসঙ্গিক উপাদানসমূহ সনাক্তকরণ, সেগুলোর সাহিত্যিক পাঠকে আকর হিসেবে বিবেচনাপূর্বক

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও তথ্যসমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধাপে পাঠ পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– শুরুতেই কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক বাসিন্দাদের ব্যবহৃত লোকভাষার অন্তর্গত ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া উল্লেখপূর্বক প্রাসঙ্গিক একাধিক দৃষ্টান্ত সংযুক্ত করা হয়েছে। এরপর বিরামচিহ্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে লেখকের প্রযুক্ত কৌশলাদির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো সংক্ষেপে আলোচিত। যেহেতু উপন্যাসটি লেখকের সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম, তাই এর অন্যতম প্রাণ হল কুশীলবদের ব্যবহৃত সংলাপ ও ভাষারীতি। এ অংশটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। কারণ কৃষ্ণনগরের লোকসমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম-সম্প্রদায়ভিত্তিক পেশাজীবী ও অপেশাদার নারী-পুরুষের উচ্চারিত সংলাপের স্বাতন্ত্র্য নির্বাচিত বিভিন্ন সংলাপের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে যুক্ত হয়েছে লেখকের স্বকীয় জীবনদৃষ্টি ও সহানুভূতিযুক্ত গদ্যরীতির প্রয়োগদৃষ্টান্ত, যা তাদের অস্তিত্বসংগ্রামের গ্লানি ও নিরন্তর লড়াইকে ধারণ করে। সংলাপের প্রয়োগকৌশল যেসব ভাষিক উপাদানকে আশ্রয়পূর্বক বিন্যস্ত হয়েছে, সেগুলো হল– অপ্রচলিত বা স্বল্প প্রচলিত শব্দের প্রায়োগিক অর্থ, পুনরাবৃত্তিমূলক সংলাপ, বিকল্প শব্দ প্রয়োগ, অলংকারশোভিত বাক্যবিন্যাস (উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্প, সন্দেহ, সমাসোক্তি, অন্যাসক্ত), অপভাষা, শব্দমিশ্রণ প্রভৃতি। এর পরবর্তী ধাপে সামাজিক প্রতিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় বিভিন্ন কারণে কুশীলবদের অনুসৃত দেহভঙ্গিমা, ইশারা-ভাষা বা গুপ্ত ভাষা, লোকভাষাশ্রিত লোকসাহিত্য (ছড়া ও মেয়েলি বুলি, লোকসঙ্গীত) প্রভৃতি এবং সর্বশেষ ধাপে লোকভাষাশ্রিত সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ (লোকসম্ভাষণ, সনাতনী পৌরাণিক প্রত্ন-প্রতিমা ও ইসলামী অনুষঙ্গের প্রয়োগ, দিব্যি দেয়া, কিরা কাটা) প্রভৃতি লোকসংস্কার সনাক্তপূর্বক প্রাসঙ্গিক আলোচনা পরিসমাপ্ত হয়েছে। এরপর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২.৩. *গবেষণার উপাত্ত*

মানুষ সামাজিক জীব আর সামাজিক মানুষের আন্তঃসংযোগের প্রধান মাধ্যম হল ভাষা। তাই সমাজকাঠামোর ওপর ভাষার প্রভাব প্রত্যক্ষ ও সরাসরি প্রতিফলিত হয়। এক্ষেত্রে লোকভাষা যেহেতু সমাজের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে প্রচলিত হয়েও সেই সমাজের সার্বিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পার্শ্বিক ভূমিকা রাখে, তাই সমাজভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে এর নিবিড় সংযোগ অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি মিলেমিশেই লোকভাষার বিন্যাস ও প্রচলন ঘটে। এমনকি লোকসংস্কৃতির মৌখিক উপাদানগুলোর সঙ্গে ভাষিক উপাদানগুলোর সমন্বয় ও পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে। লোকভাষাকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গবেষককে একইসঙ্গে সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে যেমন সম্যকভাবে অবহিত থাকতে হয়, তেমনিভাবে তিনি যে লোকগোষ্ঠীর লোকভাষাকে গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছেন, এর প্রচলন, ব্যবহারকারীদের ভাষিক ও মনোভঙ্গিগত প্রবণতা, সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা, এমনকি তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কেও

যথাযথ ধারণা গ্রহণ জরুরি। লোকভাষার প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য অনুধাবনে এর অন্তর্গত ভাষিক উপাদানগুলো সনাক্তকরণ, লোকভাষা ব্যবহারকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল, সাংস্কৃতিক দিক ও মান, লোকগোষ্ঠীভুক্ত নারী-পুরুষের ভাষাবৈচিত্র্য, লোকভাষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পেশাজীবীর সম্পৃক্ততা, ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাব, বহিরাগত ও ব্যবহৃত অন্য ভাষার সঙ্গে লোকভাষার সংযোগ, বহুভাষা পরিস্থিতি, ভাষা ও প্রাকৃতিক প্রতিবেশ, দেহভঙ্গিমা ও গোপন ভাষা-সংকেত প্রভৃতি বিষয়ে গভীরভাবে আলোকপাত করা জরুরি। বর্তমান প্রবন্ধে কুশীলবদের ব্যবহৃত লোকভাষা বিশ্লেষণে আমরা ক্ষেত্র সমীক্ষা পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল হইনি। বরং নজরুলের বিখ্যাত উপন্যাস *মৃত্যুক্ষুধা*য় সন্নিবিষ্ট কৃষ্ণনগরের নাগরিক লোকভাষাকে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছি। উপন্যাসটি প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রচিত এবং এতে ঔপন্যাসিক যে লোকভাষা ব্যবহার করেছেন, তা একান্তই তাঁর সহজাত ও সাবলীল সাহিত্যিক নির্মাণ। উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কুশলীলবদের ঘটনানুক্রমিক উপস্থিতি বিশেষভাবেই তাঁর মৌলিক পরিকল্পনা ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনজাত। এক্ষেত্রে কৃষ্ণনগরের লোকভাষা ও কুশীলবদের সংলাপ গ্রন্থনায় তিনি স্বীয় জীবনদৃষ্টি, পারিপার্শ্বিকতাপুষ্ট অর্জিত অভিজ্ঞতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ ও লোকসমাজের বাসিন্দাদের আন্তঃসম্পর্ক, লোকভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের অভ্যাস, আচরণ, প্রবণতা ও মনোভঙ্গিগত স্বকীয়তা প্রভৃতিকে শৈল্পিক মান ও বিবেচনার আলোকে উপন্যাসটিতে রূপায়ণে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কৃষ্ণনগরের লোকভাষা বিশ্লেষণে সেখানকার লোকগোষ্ঠীভুক্ত কুশীলবদের সরাসরি ব্যবহৃত ভাষা, সংলাপ, শব্দভাণ্ডারকে গবেষণার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে পারিনি। তাই এ উপন্যাসে ব্যবহৃত লোকভাষার সাহিত্যিক প্রয়োগ অনুধাবনের জন্য কৃষ্ণনগরের লোকভাষার বিভিন্ন উপাদান সনাক্তকরণ, এসব উপাদানের স্বকীয় প্রয়োগ, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে লোকভাষাভুক্ত উপাদানগুলোর আন্তঃসম্পর্ক নির্ধারণ এবং সমাজভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে লোকভাষার সংযোগবিধি প্রভৃতি পর্যবেক্ষণপূর্বক বিশ্লেষণ করা জরুরি।

৩. লোকভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ

৩.১. লোকভাষার অন্তর্গত ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন

লোকভাষা যেহেতু বিশেষ লোকগোষ্ঠীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত সীমায়ত পরিসরে প্রচলিত থাকে, ফলে এতে ভাষিক উপাদানগুলোর সম্প্রসারণ ও পরিবর্তনগত ব্যাপ্তি সংখ্যাধিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত মূল ভাষার চেয়ে তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ ও স্বল্প আবেদন

সঞ্চারে সমর্থ। তবে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, এমনকি লোকভাষিক গুণাবলী এতে অধিক বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষিত থাকে। কারণ এ ভাষার প্রয়োগ ও পরিবর্তনের ব্যাপ্তি তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে ঘটে। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে প্রযুক্ত কৃষ্ণনগর-নদীয়ার লোকভাষার সংলাপরাশিতে প্রযুক্ত মূল শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনঘটিত নতুন শব্দটির উল্লেখ ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটির নাম নির্দেশিত–

আদি স্বরাগম: স্পর্ধা>আস্পর্ধা

মধ্য স্বরাগম: কুড়ায়>কুড়োয়, ব্যারাম>বেয়ারাম, গ্লাস>গেলাস, কুরুক্ষেত্র>কুরুক্ষেত্তর, মিস্ত্রি>মিস্তিরি

অন্ত্য স্বরাগম: চুমু>চুমো, সুতা>সুতো, করবিনা>করবিনে

অপিনিহিতি: খ্রিস্টান>খেরেস্তান, রাত্রি>রাত্তির

স্বরসঙ্গতি: বলছে>বলচে, উনুন>রুনুন, এসেছে>এয়েছে, স্বামী>সোয়ামী, অস্বস্তি>অসোয়াস্তি, থাপ্পড়>থাপফড়

সম্প্রকর্ষ: হয়েছিল>হয়েলো, গিয়েছিলাম>গিয়েলাম, মসজিদের>মজিদের

সমীভবন: অনাসৃষ্টি>অনাছিষ্টি

বিষমীভবন: রাজার>আজার, থিয়েটার>থিয়েটর, যাত্রা>যাত্তা, কলকাতা>কলকেতা

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন/ লজেন্স>লজঞ্জুস, মাত্র>মাত্তর, ছোট>ছোট্ট, বড়>বড্ডো, এখনই>এখখুনি

অন্তর্হতি: সাহেব>সায়েব

ব্যঞ্জন বিকৃতি: সিগারেট > ছিকরেট, নিকাহ > নিকে

অভিশ্রুতি: চল্লিশা > চালশে

র-কার লোপ: হাঁড়>হাড্ডি

হ-কার লোপ: গৃহস্থালি>গেরস্তালি, গুনাহ>গুনা

৩.২. *বিরামচিহ্ন*

বিরামচিহ্নের প্রয়োগ বক্তার মনোভাব, আবেগ ও সংবেদনাকে ধারণ ও প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি বক্তার মানসিক অবস্থাকে প্রকাশের পাশাপাশি শ্রোতার নিকট বক্তব্য অর্থপূর্ণভাবে অনুধাবনের সহায়ক উপায় হিসেবেও ভূমিকা রাখে। চরিত্রের আবেগ ও মনস্তত্ত্বকে বাক্যের কাঠামোতে ধারণের তাগিদে বিরামচিহ্নের বৈচিত্র্যময় সংযোগ এ উপন্যাসের বর্ণনা ও কুশীলবদের সংলাপে লক্ষণীয়। যেমন–

ক. লেখকের বয়ানে চরিত্রের আবেগ ও আচরণ প্রকাশে একাধিক বিরামচিহ্নের পাশাপাশি প্রয়োগ—

তার (হিড়িম্বার) ভাষা গজালের মা-র মতো ক্ষুরধার না হলেও তার শরীর এবং স্বর এ দুটোর তুলনা মেলে না!– (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৪)

খ. চরিত্রের আচরণ সম্পর্কে জানাতে কমার প্রাধান্যসূচক দীর্ঘ বাক্য গঠনে লেখক মনোযোগী হয়েছেন, যেখানে তাদের জীবনবাস্তবতাও গ্রন্থিত–

বিধাতার দেওয়া ছেলেমেয়ে এরা বিধাতার হাতেই সঁপে দিয়ে নিশ্চিত মনে পান্তা-ভাত খেয়ে মজুরিতে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে এসে বড় ছেলেটাকে বেশ করে দু-ঘা ঠেঙায়, মেজোটাকে সম্বন্ধের বাচবিচার না রেখে গালি দেয়, সেজোটাকে দেয় লজঞ্চুস, ছোটটাকে খায় চুমো, তারপর ভাত খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়। (ইসলাম, ২০০৭: ৩০৪)

গ. চরিত্রের বিস্ময় ও ভাবাবেগ প্রকাশে বিভিন্ন বিরামচিহ্নের সঙ্গে বিস্ময়সূচক চিহ্নের ধারাবাহিক প্রয়োগ সংলাপে লক্ষণীয়–

গয়লাদের ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে পচা রে, উই শালা পচা! ছুটে আয় রে ছুটে আয়! তোর দিদিমা 'মা-কালি' হয়ে গিয়েছে।' (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৬)

ঘ. চরিত্রের আবেগ ও আচরণের সমাহারে মনস্তাত্ত্বিক চালচিত্র সংলাপে প্রতিফলিত হয়েছে বিরামচিহ্নের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগের মাধ্যমে–

রোতো ঘেমে উঠে ভীত চোখের দৃষ্টিতে চারদিকে চায়, তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'না ভাই, আর কাজ নেই। সেদিনের কথা মনে পড়লে আমার বুক আজো দুরুদুরু করে ওঠে। ... শালা ডাকাত! ... সে আবার আসছে কখন?' (ইসলাম, ২০০৭ : ৩৩৯)

৩.৩. লোকভাষাশ্রিত সংলাপ

সংলাপ উপন্যাস রচনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কুশীলবদের ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসেবে এর বলিষ্ঠ ভূমিকা অনস্বীকার্য। যেহেতু উপন্যাস আধুনিককালের মানবজাতির প্রবহমান জীবনধারার বিস্তৃত শিল্পভাষ্য, তাই এতে রক্ত-মাংসের মানুষের প্রতিনিধি কুশীলবদের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপায়ণ অধিক বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তবসম্মতভাবে প্রতিফলিত হয়। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিক্ষুব্ধতা ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরূপ অভিঘাতসঞ্জাত। তাই কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক লোকগোষ্ঠীর জীবনধারার চালচিত্র গ্রন্থনায় লেখক সংলাপের প্রতি সচেতন অভিনিবেশ প্রদান করেছেন। তিনি আটাশ পরিচ্ছেদে বিধৃত উপন্যাসটির কুশীলব হিসেবে যাদেরকে সামনে এনেছেন, তারা রাজমিস্ত্রি, খানসামা, বাবুর্চি, গাড়োয়ান, কোচোয়ান, চাষি, কুলি-মজুর, মেথর, গয়লা, মুর্দাফরাশ, ধাত্রী বা দাই, কামার, ঘরামি, ক্যাওরা প্রভৃতি পেশাভুক্ত। তাদের

আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাস, প্রাত্যহিক দিনযাপন, আলাপচারিতা ও নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অনুসারী হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ ও নির্ধারণ অর্থাৎ সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিপুল সংখ্যক কায়িক শ্রমজীবীর অবলম্বিত লোকভাষা সেকারণেই উপন্যাসটির শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। নাগরিক পরিমণ্ডলে অবস্থানরত লোকসমাজের ভাষা যে গ্রামীণ সমাজের মাটিঘেঁষা ভাষার আঘ্রাণ থেকে বহুদূরবর্তী ও স্বকীয় আমেজের, উপন্যাসটির নিবিড় পাঠে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর বিশেষ কারণ হল, বিশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষভাগের পরিসরে বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিসমূহের অভিঘাত এ উপন্যাসের কুশীলবদের মনোজগতে প্রভাব বিস্তার করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত থেকেছে ঔপনিবেশিক শোষণের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া, মিশনারী কর্তৃক ধর্মান্তরকরণ, আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা এবং তথাকথিত ভদ্র সংস্কৃতি-নাগরিকায়ণের প্রভাব প্রভৃতি। তাই খেটে খাওয়া কায়িক পেশাজীবীদের পাশাপাশি নিম্নবর্গের নারীদের ভাষিক বৃত্তকাঠামোকেও লেখক উপন্যাসটিতে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। সামাজিক শ্রেণি-পেশা-বর্ণ-সম্প্রদায়-লৈঙ্গিক পরিচয় প্রভৃতি মিলেমিশে এ উপন্যাসের ভাষিক কাঠামোকে করেছে বর্ণাঢ্য, জমজমাট, অর্থগত দ্যোতনায় ব্যঞ্জনামুখর। এছাড়া তৎকালীন ভাষিক পরিসরের স্বরূপ অনুধাবনেও উপন্যাসটির বয়ান তাৎপর্যবহ।[১৮] এক্ষেত্রে কুশীলবদের সংলাপ নির্মাণের কৌশলসমূহ হয়ে উঠেছে লেখকের মোক্ষম হাতিয়ারবিশেষ, যা পাঠকের অভিনিবেশ আকর্ষণে সফল, কার্যকর হয়ে উঠেছে। লোকভাষাশ্রিত সংলাপের বৈচিত্র্য ও প্রবণতাসমূহ অনুধাবনের প্রচেষ্টা নিচে লক্ষণীয়–

ক. ঝগড়া তখন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং গজালের মা বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলচে, 'হারাম-খোর, খেরেস্তান কোথাকার। হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শুয়োরের মতো চর্বি হয়েছে, না লা?'

গজালের মাকে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পেতলের কলসিটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অঙ্গ দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মতো মুখ বিকৃত করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তা বলবি বৈ কি লা সুঁটকি! ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ির হারাম-রাঁধা পয়সা খেয়ে চেক্‌নাই বেড়েছে কিনা!'

গজালের মা রাগের চোটে তার ভরা কলসির সবটা জল মাটিতে ঢেলে ফেলে আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, 'ওলো আগ্‌-ধুমসী (রাগধুম্‌সী)! ওলো ভাগলপুরে গাই! ওলো আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাঁধে নাই লো, আমার ছেলে জজ সায়েবের খানসামা ছিল– জজ সায়েবের লো, ইংরেজের!'

পুঁটের মাও খেরেস্তান, তার আর তর সইল না। সে তার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে বলে উঠল, 'আ-সইরন সইতে নারি, সিকেয় ইয়ে দিয়ে ঝুলে মরি!

বলি, অ'গজালের মা! ঐ জজ সায়েবও আমাদেরই জাত। আমরা 'আজার' (রাজার) জাত, জানিস?' (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৪-৩০৫)

খ. মেয়েদের ঘর থেকে শাশুড়ি তার নবাগত নাতিকে মেয়ের কোলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসে কান্নাকটু কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, 'মর্ মর্ মর্ তোরা। এত লোককে নেয়, আর তোদেরই ভুলেছে যম।' তারপর বৌদের উদ্দেশ্য করে বলে, 'নে লা বেটাখাগীরা, তোদের এই হারামদের মাথা চিবিয়ে খা। মাগিরা শুয়োরের মতো ছেলে বিইয়েছে সব। বাপরে বাপ! জান যেন তেতবিরক্ত হয়ে গেল। (ইসলাম, ২০০৭: ৩১৪)

গ. নকড়ি ডাক্তার নাড়ি দেখে বললেন, 'অবস্থা বড় ভালো ঠেকছে না রে, হার্টফেল করার বড্ডো ভয়।'

মেজো-বৌ ইশারায় প্যাঁকালেকে ডেকে ফিস ফিস করে বলল, 'আচ্ছা বেহুঁশ ডাক্তার তো, রোগীর কাছে তার অবস্থা এমনি করে বলে নাকি?'

নকড়ি ডাক্তার বোধ হয় ততক্ষণে মেজো-বৌয়ের ইশারার মানে বুঝে নিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে প্যাঁকালেকে ডেকে বলল, 'ওরে, তোদের বাড়ি মুরগির বাচ্চা আছে তো? একটু ঝোল করে খাওয়া দেখি। এখখুনি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। ভাবিসনে কিছু, ও ভালো হয়ে যাবে 'খন।' বলেই হাই তুলে দুটো তুড়ি মেরে মেজো-বৌয়ের মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যেন গিলে খাবে! মেজো-বৌ একটু হেসে হেঁসেল ঘরে সরে গেল। বড়-বৌ বলে উঠল, 'কি লা হাসছিস যে বড়!'

মেজো-বৌ ডাক্তার শুনতে পায় এমনি জোরেই বলে উঠল, 'আখার বাসি ছাইগুলোর কিনারা হল দেখে।' বলেই একটু হেসে আবার বলে উঠল, 'যেমন উনুনমুখো দেবতা, তেমনি ছাই-পাস নৈবেদ্যি।'

ডাক্তার ততক্ষণে উঠে পড়েছে। তখন রোগীর চেয়ে তার নিজের নাড়িই বেশি চঞ্চল। ... দোরের কাছে হঠাৎ একটু থেমে ডাক্তার বলল, 'হ্যাঁরে মুরগির ডিম আছে তোদের বাড়ি? একটু ওষুধের জন্য বড্ডো দরকার ছিল আমার।' ...

মেজো-বৌ একটু চেঁচিয়েই বলল, 'ডাক্তারের গলায় ওটা কি ঝুলছে ছোট মিয়ে? মিনসে কি গলায় দড়ি দিলে?' (ইসলাম, ২০০৭ : ৩২০-৩২১)

ঘ. শাশুড়ি একটু লজ্জিত হয়েই চোখ মুছে বড়-বৌ যেখানে উঠোন নিকুচ্চির, সেখানে এসে চুপ করে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ লা বড়-বৌ, সত্যিই ছুঁড়ি নিকে করবে না তো? ছুঁড়ির যা রূপ ঠিকরে পড়ছে এখনো, তার ওপর পাড়ার মাগনেড়ে হতচ্ছাড়ারা দিনরাত আছে ছুঁড়ির পানে হা-পিত্যেশ করে তাকিয়ে। আ মলো যা! ড্যাকরারা যেন হুলো বেড়াল! ইচ্ছে করে, দিই চোখে লগা ঠেলে। আর ঐ বুড়ো মিনসে–ওর বোনের সোয়ামী–মিনসে যে ওর সানি-বাপ! মিনসের লজ্জা করল না কলকেতা থেকে কেষ্টনগর

ছুটে আসতে ঐ মেয়ের বয়েসী বেটাকে নিকে করতে! ঝ্যাঁটা মার। ঝ্যাঁটা মার!' (ইসলাম, ২০০৭ : ৩২২)

ঙ. সেদিন হঠাৎ কুর্শি তার একেবারে চোখের সামনে এসে পড়ল। সে কিন্তু হেসে উঠল, 'আ মর্ ড্যাকরা! যেন চেনেনই না আমায়! তোর হল কি বল তো!

রোতো ঘেমে উঠে ভীত চোখের দৃষ্টিতে চারিদিকে চায়, তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'না ভাই, আর কাজ নেই। ... শালা ডাকাত! ... আমি ইচ্ছে করলে শালাকে সেদিন গুঁড়িয়ে দিতে পারতুম, শুধু তোর জন্যেই দিইনি।'

কুর্শি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, 'মাইরি বলছিস, তুই তাকে মারতে পারবি এবার এলে? ঐ কচার বেড়ার ধারে– যেখেনে সে আমায় কন্নিক ছুঁড়ে মেরেছিল, ঐকেনে ওকে মেরে শুইয়ে দিতে পারবি? ...

'এই তোকে ছুঁয়ে বলে রাখলাম কুর্শি, ওকে যদি ঐখেনে মেরে শুইয়ে না দিই, তবে আমি বাপের বেটা নই। একবার এলে হল শালা!'

কুর্শি ঝাঁকানি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'মর হতচ্ছাড়া! বড় যে আস্পর্ধা তোর দেখছি! আমার হাত ধরেন এসে! একবার মেরেই দেখিস, পিঠের ওপর খ্যাংড়ার বাড়ি কেমন মিষ্টি লাগে!' (ইসলাম, ২০০৭: ৩৪০)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে মুসলমান গজালের মা ও খ্রিস্টান হিড়িম্বার বা নুলোর মায়ের বিবাদের মূলে রয়েছে ধর্মীয় জাত্যাভিমান। হিড়িম্বা যেহেতু ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেছে, তাই তাকে বিধর্মী হিসেবে বিবেচনাবশত গালিগালাজে বশীভূত করতে সে তৎপর। এর জবাবে হিড়িম্বাও তাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছে, যেহেতু মুসলমান হলেও গজাল খ্রিস্টান মালিকের বাড়িতে খানসামার কাজ করে পেট চালায়। কিন্তু ইংরেজ যেহেতু শাসক ও ভারতের প্রভু, তাই খ্রিস্টান পরিচয়ের চেয়ে ইংরেজ হিসেবে নিজেকে তার অনুচর হিসেবে বিবেচনার ব্যাপারটি গজালের মায়ের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। খাতুনের মায়ের পাল্টা যুক্তি হল, সে যেহেতু খ্রিস্টান, আর জজ সায়েব খ্রিস্টান ইংরেজ, তাই মুসলমান হিসেবে গজালের মার অবস্থান তাদের চেয়ে নিচে। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে একান্নবর্তী বড় পরিবারের কর্ত্রী, স্বামী ও তিন ছেলেহারা বিধবা বৃদ্ধা গজালের মায়ের সংলাপে প্রকাশিত হযেছে দারিদ্র্যের পীড়ন, অনটনে ভুক্তভোগী হয়েও পরিবারের দায়িত্ব বহন করার বাধ্যবাধকতাহেতু মনে পুঞ্জীভূত চরম অসন্তোষ ও বিতৃষ্ণা। স্বজনদের প্রতি তার অভিসম্পাতের ঘটনায় প্রতীয়মান হয় জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত ও ভগ্নোদ্যম এক বৃদ্ধার অসহায়ত্ব ও নিরাশা। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে সুযোগসন্ধানী চিকিৎসক ও বুদ্ধিমতি, সংসারাভিজ্ঞা গৃহবধূর পারস্পরিক মনোযুদ্ধের রূপায়ণ ঘটেছে ডাক্তার ও মেজো-বৌর আক্রমণ-প্রতিআক্রমণাত্মক সংলাপ বিনিময়ে। রোগীর চিকিৎসা করতে এসে সুযোগসন্ধানী চিকিৎসকের আখের গুছিয়ে নেবার পায়তারা মেজো-বৌর

বিবেচনায় চাতুরি হিসেবে প্রতিভাত হওয়ায় সেও তাকে নিবৃত্ত করতে শ্লেষযোগে বাঁকা কথা শোনায়। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে রূপবতী, ব্যক্তিত্বময়ী মেজো-বৌর প্রতি তার দুলাভাই ও পাড়ার পুরুষদের লোভী দৃষ্টিদানের বিষয়টি খেয়াল করে তার শাশুড়ি গজালের মার বিরূপ মনোভঙ্গি ও আক্রমণাত্মক অবস্থান প্রকাশিত। মেজো-বৌকে বৃদ্ধা অত্যন্ত ভালোবাসে। তাই সে কোনোভাবেই চায় না, আবার বিয়ে করার মোহে মেজো-বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার ছেড়ে চলে যাক। কৃষ্ণনগরের মেয়েলি ভঙ্গিপ্রবণ এ সংলাপে আশ্রিত গালিগালাজ ও আক্রমণাত্মক বাক্যবাণ নিক্ষেপের মাধ্যমে বৃদ্ধার বিরূপ মানসিকতা প্রকাশিত। 'ঙ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে তরুণ-তরুণীর প্রণয়ঘটিত জটিলতার ভাষ্যরূপ নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত। প্যাঁকালের প্রতি ভালোবাসায় উন্মুখ কুর্শির কাছে রোতো কামারের প্রেম নিবেদন রীতিমত বিরক্তিকর। খলনায়কতুল্য রোতো জোর করেই তাকে পেতে সচেষ্ট হলেও বুদ্ধিমতি কুর্শি তাকে প্রণয়লীলার ফাঁদে ফেলতে পটু। প্রতিদ্বন্দ্বী প্যাঁকালেকে পরাভূত করার জন্য রোতোর সুদৃঢ় ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যানে কুর্শি যে দ্বিধাহীন, প্রেমিকের প্রতি তার ভালোবাসার আকুতি তাতে স্পষ্টই ঘোষিত।

এছাড়াও প্রান্তিক চরিত্রের মনোবাস্তবতার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ-বিবরণে নজরুল সংযুক্ত করেছেন বহুস্বরিক দ্যোতনা, যেখানে ঔপন্যাসিকের সচেতন দৃশ্যবর্ণনা তাদের প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতাকে অধিক প্রগাঢ় ও জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলে–

মা-বাপের নাম শুনতেই ঢুলতে ঢুলতে খুকি বলে ওঠে, 'দাদি, তুই আব্বার কাছে যাবি? আব্বা যেখানে তাকে সেই বেশিদূর, না, মা যেখানে থাকে সেই বরিশাল বেশি দূর?' ... শান্ত বৃদ্ধা ছটফট করে ওঠে। একটা ভীষণ যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে পাশ ফিরে শুয়ে বলে, 'ঐ বরিশালই বেশি দূর, ঐ বরিশালই বেশি দূর।' ... বৃদ্ধা শুয়ে শুয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে। মনে হয়, কামারশালে বুঝি পোড়া কয়লা জ্বালাতে হাপরের শব্দ হচ্ছে। ... ছেলেটি জেগেই থাকে। কি সব ভাবে, মাঝে মাঝে রান্নাঘরের দিকে চায়। সেখানে অন্ধকার দেখে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে না। ... বড়-বৌ মসজিদের দ্বার থেকে কোলে করে আনতে চায়, সে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে। ... মসজিদের ভিতর থেকে মৌলবি সাহেবের কণ্ঠ ভেসে আসে। ... অন্ধকার ঘরে ক্ষুধাতুর শিশুর মাথায় ওপর দিয়ে বাদুড় উড়ে যায়–আসন্ন মৃত্যুর ছায়ার মতো।... ঘুমের মাঝে খুকি কেঁদে ওঠে, 'মাগো আমি আব্বার কাছে যাব না। আমি তোর কাছে যাব, বরিশাল যাব।' খণ্ড অন্ধকারের মতো বাদুড় দল তেমনি পাখা ঝাপটে উড়ে যায় মাথার ওপর– রাত্রি শিউরে ওঠে। (ইসলাম, ২০০৭: ৩৭৪-৩৭৫)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে নজরুলের গদ্যরীতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন চরিত্রের সমাহারে ঘটনা সংঘটনের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত কুশীলবদের উপস্থিতিকে অধিক বিশ্বাসযোগ্য ও অস্তিত্বশীল করে তুলতে তাদের মুখে ব্যবহৃত সংলাপের সমান্তরালে

ঔপন্যাসিকের বয়ান সম্পূরকভাবে যুক্ত হয়েছে। এর কারণ, চরিত্রগুলোর বিচিত্র আবেগ, আচরণ ও প্রবণতা, মনোভাবনার সঙ্গে তাদের যাপিত জীবনসংলগ্ন ঘটনারাজির খণ্ডিত বিবরণ ও প্রসঙ্গ মিলেমিশে একটি চালচ্চিত্রিক ক্যানভাসকে জীবন্ত করে তোলে।[১৯] বিভিন্ন চরিত্রের নিজস্ব সংলাপের সঙ্গে প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের নিবিড় সংযোগ মিলেমিশে দৃশ্যাবলিকে রক্তমাংসের মানুষের আদলে পাঠক-দর্শকের নিকট উপস্থাপন করে।

৩.৩.১ *সংলাপ ও বর্ণনায় অপ্রচলিত বা স্বল্প প্রচলিত শব্দের প্রায়োগিক অর্থ*

> তবু যদি ভাতারের ধুমসুনি না খেতিস দুবেলা!' ('মার' বা 'প্রহার' অর্থে প্রযুক্ত) (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৫)
>
> যেটা উনুন-শাল, সেইটেই ঢেঁকিশাল ('ঘর' অর্থে প্রযুক্ত) (ইসলাম, ২০০৭ : ৩১১)
>
> গলা তো নয়, যেন হাঁড়োল ('গাড়ল' এর পরিবর্তিত শব্দরূপ, 'অপদার্থ' অর্থে প্রযুক্ত) (ইসলাম, ২০০৭ : ৩১৩)
>
> বড়-বৌ আদর করতে আসে, কেঁদে ওরা হাত ছাড়িয়ে নেয়। অকারণ আখোট করে। ('বিবাদ' অর্থে প্রযুক্ত) (ইসলাম, ২০০৭: ৩৭৪)

৩.৩.২. *পুনরাবৃত্তিমূলক সংলাপ*

একই শব্দ, খণ্ডবাক্য, বাক্যের পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি লোকসমাজের বাসিন্দাদের সংলাপে লক্ষণীয়। এমনকি স্বরচিত গানেও এর প্রয়োগ ঘটে। যেমন–

> সকলে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওলো, ছেলে হয়েছে লো! ছেলে হয়েছে যে!' (ইসলাম, ২০০৭ : ৩১০)
>
> (গাড়োয়ান) শেষের কলিটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগল–'ও ছুঁড়িরা মজাইল, হায় ছুঁড়িরা মজাইল কুল।' (ইসলাম, ২০০৭ : ৩১৩)

৩.৩.৩ *বিকল্প শব্দ প্রয়োগ*

কখনো কখনো চরিত্রের আবেগ ও মনোভাবনা প্রকাশের সংকোচ প্রকাশিত হওয়ায় যথোপযুক্ত শব্দ নির্বাচনের পরিবর্তে সেটি এড়িয়ে গিয়ে অন্য শব্দ ব্যবহারের রীতিও সংলাপে প্রকাশিত। যেমন–

> তুমি থাম মেজো-ভাবী, সব সময় ইয়ে ভাল লাগে না (ইসলাম, ২০০৭ : ৩২১) (এ সংলাপে 'ইয়ে' শব্দটি 'রসিকতা' অর্থ প্রকাশে প্রযুক্ত।)
>
> তোমারও মা তেমনি যত সব কি-বলে-না-ইয়ে (ইসলাম, ২০০৭ : ৩২৩) (এ সংলাপে 'ইয়ে' শব্দটি 'বাড়াবাড়ি' অর্থ প্রকাশে প্রযুক্ত।)

একদিন ভাবী বলেছ বলে বুঝি আর ইয়ে করতে নেই! (ইসলাম, ২০০৭ : ৩২৯) (এ সংলাপে 'ইয়ে' শব্দটি 'বিয়ে' অর্থ প্রকাশে প্রযুক্ত।)

৩.৩.৪ অলংকারশোভিত বাক্যবিন্যাস

উপমা

মেজো-বৌ তখনো বাণ ছুঁড়তে থাকে। শিকারী যেমন করে আহত শিকার না মরা পর্যন্ত বাণ ছুঁড়তে বিরত হয় না। (ইসলাম, ২০০৭ : ৩২৭)

উৎপ্রেক্ষা

পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর। ... যেন কোনো খেয়ালি শিশুর খেলাশেষের ভাঙা খেলাঘর। (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৩)

রূপক

সেজো মেজো-বৌয়ের হাতটা বাঁ-বুকে জোরে চেপে বলে, 'দেখছ, মেজো-বু, বুকটা কি রকম ধড়ফড় করছে। একটা পাখিকে ধরে খাঁচায় পুরলে সে যেমন ছটফট করে বেরোবার জন্যে, তেমনি, না? (ইসলাম, ২০০৭ : ৩৪১) [পাখি ও খাঁচার সমান্তরালে মেজো-বৌয়ের মৃত্যুযাত্রাকালীন অস্থিরতা এ রূপকে প্রতিফলিত।]

প্রতীক

মাটির ঘরের মাটির শেজে শুয়ে একটি মানুষ নিবতে থাকে রিক্ত-তৈল মৃৎ-প্রদীপের মতো। তেল ওর ফুরিয়ে গেছে, এখন সলতেতে আগুন ধরেছে। (ইসলাম, ২০০৭ : ৩৪১) [অসুস্থ প্যাঁকালের মায়ের মুমূর্ষু অবস্থার পাশাপাশি তার পরিবারের সামগ্রিক প্রতিকূলতার একাধিক অনুষঙ্গ এ প্রতীকের মাধ্যমে ব্যঞ্জনাশ্রিত মাত্রায় প্রকাশিত।]

চিত্রকল্প

চোখ দুটি যেন লাবণ্যের কালো জলে ক্রীড়া-রত চটুল সফরি–সদাই ভেসে বেড়াচ্ছে ভুরু জোড়া যেন গাঙ্-চিলের ডানা–ঐ সফরির লোভে, চোখের লোভে উড়ে বেড়াচ্ছে। (ইসলাম, ২০০৭ : ৩১২)

সন্দেহ

বৃদ্ধা শুয়ে শুয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে। মনে হয়, কামারশালে বুঝি পোড়া খয়লা জ্বালাতে হাপরের শব্দ হচ্ছে। (ইসলাম, ২০০৭ : ৩৭৫)

সমাসোক্তি

গাছপালা ঘরবাড়ি–সব যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুতে থাকে। (ইসলাম, ২০০৭ : ৩৪১)

অন্যাসক্ত

গ্রীষ্মের তামাটে আকাশ, যেন কোন সর্বগ্রাসী রাক্ষসের প্রতপ্ত আঁখি। (ইসলাম, ২০০৭ : ৩৪৩)

৩.৩.৫. অপভাষা

নে লা <u>বেটাখাগী</u>রা, তোদের এই <u>হারাম</u>দের মাথা চিবিয়ে খা। (ইসলাম, ২০০৭: ৩১৪)

আমার হাত ফুলে গেল, গতরখাগীকে মারতে মারতে। হারামজাদীর পিঠ ত নয়, পাথর। (ইসলাম, ২০০৭ : ৩১৭)

তা বলবি বৈ কি লা, আমার জোয়ান-পুত-খাগি। (রফিকুল, ২০০: ৩২২)

কৃষ্ণনগর এলাকার লোকভাষায় বিভিন্ন গালিগালাজ, অশ্লীল সম্বোধন ও অপভাষার প্রয়োগ সমাজের নিম্নতলের বাসিন্দাদের সংলাপের সাধারণ প্রবণতা। প্রাত্যহিক জীবনে সংঘটিত ঘটনারাজি ও পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনগত আবেগীয় প্রতিক্রিয়া, মনোভাবনার সহজাত প্রকাশ এ অপভাষায় রাগ, ক্রোধ, ক্ষোভ, ঘৃণা এবং নেতিবাচকতা প্রভৃতিকে অকপটে ধারণ করে। দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনা প্রভৃতি তাদের জীবনবাস্তবতার অনস্বীকার্য অংশ। ফলে অপভাষার মাধ্যমে তাদের অন্তর্গত স্ফুরণের রূপায়ণ লক্ষণীয়। অপভাষা প্রয়োগের একটি স্বকীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কিছু শব্দের অর্থগত রূপান্তর কালের পরিক্রমায় ঘটে যায়। চলতিকালে 'মাগি' শব্দটি নারীর প্রতি অপমান ও গালি হিসেবে প্রযুক্ত হলেও নজরুলের এ উপন্যাসে সেটি যে অবলীলায় মা তার ছেলের সঙ্গে আলাপে উল্লেখ করতে পারে, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে সন্তানসম্ভবা বোন পাঁচির চিকিৎসার জন্য প্যাঁকালের প্রতি তার মার সংলাপে। এক্ষেত্রে 'মেয়ে' বা 'নারী'র সমার্থক হিসেবেই শব্দটি প্রযুক্ত। যেমন—

তার (প্যাঁকালের) মা একটু অনুনয়ের স্বরেই বলল 'হ্যাঁ রে, তুই যে কাজে যাচ্ছিস বড়? এদিকে যে পাঁচি আমার মরে! দেখ না একটু কাঠুরে পাড়ার দাই মাগিকে। (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৭)

মেজো-বৌয়ের রূপ পাড়ার নিত্যকার আলোচনার বস্তু। ... পাড়ার মেয়েরা বলে, 'মাগি রাড় হয়ে যেন ষাঁড় হচ্চে দিনকে-দিন। (ইসলাম, ২০০৭ : ৩২০)

৩.৩.৬ *শব্দমিশ্রণ*

লোকভাষায় বিভিন্ন দেশের ভাষার সংমিশ্রণ ঘটে। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির অবাধ সংযোগ সাধনের প্রভাব লোকভাষায় লক্ষণীয়। বহুকাল যাবত জনসমাজে প্রচলিত ভাষার বিভিন্ন ধরনের উপাদান গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে লোকভাষার শব্দভাণ্ডারে বহুজাতিক ভাষিক উপাদানসমূহ সঞ্চিত হতে থাকে। সেক্ষেত্রে ভাষার প্রমিত রূপটির পাশাপাশি উপভাষিক বা আঞ্চলিক উপাদানসমূহ কখনো সম্পূর্ণরূপে, আবার কখনো আংশিক পরিবর্তিতরূপে সেই শব্দভাণ্ডারে আশ্রয় পায়। নজরুল নিজে লেখক হিসেবে এ উপন্যাসের বিবরণধর্মিতায় যেমন বিভিন্ন আরবি-ফারসি-হিন্দি-ইংরেজি-সংস্কৃত শব্দসমূহ অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছেন, তেমনিভাবে উপন্যাসটির কুশীলবদের মুখের ভাষা বা সংলাপেও প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতাঘেঁষা বিভিন্ন অনুষঙ্গ উঠে এসেছে। লেখক যখন উপন্যাসের বয়ানে কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়ক এলাকার প্রান্তিক মানুষের কথা লিখছেন, তখন তিনি এ কৌশলকে আশ্রয় করেছেন কুশীলবদের আর্থ-সামাজিক

বাস্তবতার অনাড়ম্বর ও বিশ্বস্ত চালচিত্রকে পাঠকের নিকট বিশ্বাসযোগ্যভাবে রূপায়ণের তাগিদে।

এরা যেন মৃত্যুর মাল-গুদাম! অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই সাপ্লাই। আমদানি হতে যতক্ষণ, রফতানি হতেও ততক্ষণ! (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৩)

এর সমান্তরালে কুশীলবদের সংলাপেও রয়েছে মিশ্র শব্দভাণ্ডারের প্রয়োগ। তাদের আটপৌরে, হতশ্রী, অনটনে ভোগা বিপন্ন মানসিকতা ও জীবনযুদ্ধের লড়াইকে চোখে দেখা প্রত্যক্ষ বাস্তবতার পর্যায়ে তুলে ধরার তাগিদেই লেখক তাদের সংলাপেও মিশ্র শব্দভাণ্ডারের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যেমন–

শাশুড়ি খুশি হয়ে বলে, 'লক্ষ্মী মা আমার, পড়বি তো? আর কেউ নয় মা, শুধু তুই যদি খোদার কাছে হাত পেতে চাস খোদা আমাদের এ দুক্ষু রাখবে না ... তুই ঐ গান ছেড়ে দে দিকিন! ওতে আল্লা ব্যাজার হন। গান করলে 'গুনা' হয়, শুনিসনি সেদিন মৌলবি সায়েবের কাছ থেকে?' (ইসলাম, ২০০৭ : ৩৩৬)

এমনকি লোকজ শব্দভাণ্ডারেও অনার্য বিভিন্ন জাতি-নৃগোষ্ঠী, ধর্ম-সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত শব্দরাশির সমাহার ঘটে, যেগুলো মোটাদাগে দেশী শব্দ হিসেবে প্রচলিত। যেমন– হেঁসেল, বাছা, পিঠ, পুতুল, পান্তাভাত, গালি, কলসি, ঝগড়া,পাকা, হটবার, হাড্ডি, পেতল, ঠুকে, পেট, মাসি, দিদি, পিলে, টিপ্পনি, উনুন, চুল, আঁচল, ছাই, পোটলা, বৌ, ঘুড়ি, কাঠ, পাড়া, গাই, কাঁখে, চিমটি. ভাতার, গা, চটি, খেদ, ঘোমটা, ঢেঁকি, পান, থালা, তেল, কোঁচড়, আয়না, নাচ, দাই, খড়, বিড়ি, নিমা, কাঠি, শালা প্রভৃতি।

৩.৪. দেহভঙ্গিমা

মুখের ভাষা বা সংলাপের পাশাপাশি ইশারা-ইঙ্গিত, কৌশলে মনের ভাব প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন দেহভঙ্গিমার মাধ্যমেও ব্যক্তির আচরণ, আবেগ ও মনস্তত্ত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় রেখে ব্যক্তির আচরণে ভিন্নতা পরিস্ফুট হয়। কখনো অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক বিন্যাসের ক্ষেত্রে, কখনো বা সমষ্টিজনের উদ্দেশ্যে, ওঠাবসা বা আদানপ্রদানে, সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলা বা স্বীয় পরিকল্পনামাফিক কার্যসাধনে এর প্রয়োগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই লোকসমাজে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীর আচরণ ও ব্যবহারে এর অধিক প্রয়োগ ঘটে থাকে। উল্লেখ্য, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর গণ্ডি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ও সীমিত। ঘর-সংসারকেন্দ্রিক ঘেরাটোপে তাকে বিভিন্ন কাজে নিত্যদিন ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। তাই নিজের ভাবনা ও আবেগ প্রকাশে পুরুষের তুলনায় নারীকে অনেক বেশি কোণঠাসা থাকতে হয়। সে নিজের মত করে চলতে গিয়ে প্রায়শ পারিবারিক বিধিনিষেধ

ও সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে দেহভঙ্গিমা হয়ে ওঠে স্বীয় আবেগ, অনুভব ও সহজাত আচরণের মাধ্যম।

গজালের মাকে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পেতলের কলসিটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অঙ্গ দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মতো মুখ বিকৃত করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তা বলবি বৈ কি লা সুঁটকি! ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ির হারাম-রাঁধা পয়সা খেয়ে চেক্‌নাই বেড়েছে কিনা!' ... এইবার হিড়িম্বা ফস করে তার চুল খুলে দিয়ে একেবারে 'এলোকেশী বামা' হয়ে দাঁড়ালো, এবং কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে খাতুনের মার মুখের সামনে হাত দুটো বারকয়েক বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠল (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৪-৩০৫)।

৩.৫. ইশারা-ভাষা

ইশারা-ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সভ্যতার ঊষালগ্নে গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষ আকার-ইঙ্গিতে নিজের মনে পুঞ্জীভূত ভাবের দ্যোতনাকে অন্যের কাছে প্রকাশের জন্য সচেষ্ট থেকেছে। এর প্রভাব লোকসমাজের বাসিন্দাদের আচরণেও লক্ষণীয়। খ্রিষ্টান মধু ঘরামির উঠতিবয়সী মেয়ে কুর্শির সঙ্গে মুসলমান যুবক প্যাঁকালের প্রেমের বৃত্তান্ত অন্যদের নিকট থেকে আড়াল করতেও এ কৌশল অনুসৃত হয়। প্যাঁকালে বিশেষ গানের মাধ্যমে তার উপস্থিতি জানালে কুর্শি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। রাজমিস্ত্রি দলের অন্যদের আড়াল করতে প্যাঁকালে সচেষ্ট ছিল। সর্দার অন্যদের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত থাকায় সেই সুযোগে 'কুর্শি তাদের কচার বেড়ার ধারে চোখ-ভরা ইঙ্গিত নিয়ে এসে দাঁড়াল এবং প্যাঁকালেও হঠাৎ পিছিয়ে পড়ল।' (ইসলাম, ২০০৭ : ৩১২) কিন্তু তখন গাড়োয়ান ন্যাড়া গয়লা গরুর গাড়ি নিয়ে সে রাস্তায় চলতে গিয়ে তাদেরকে লক্ষ করায় তারাও কৌশল অবলম্বন করে পারস্পরিক প্রণয়বৃত্তান্ত এড়িয়ে যাবার তাগিদে। লেখক রম্যরসযোগে, চিত্তগ্রাহী বর্ণনাশ্রয়ে প্রণয়ীযুগলের কৌশলী অভিপ্রায়ের বৃত্তান্ত জানিয়েছেন–

প্যাঁকালে অকারণে পাশের রেতো কামারের দোকানে ঢুকে পড়ে। গাড়োয়ান শুনতে পায় এমনি চেঁচিয়েই বলল, 'এই! আমার বড়শিটা কখন দিবি?' বলা বাহুল্য কামারকে সে বড়শি গড়তে কোনদিনই দেয়নি। ... ওদিকে কুর্শি হঠাৎ কলসি নামিয়ে একটা কচার ডাল ভেঙে পাশের ছাগলটাকে অকারণে দু ঘা কষিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'পোড়ারমুখির ছাগল রোজ রোজ এসে বেগুন গাছ খেয়ে যাবে!' ... এখানেও বেগুন গাছের উল্লেখটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। (রফিকুল, ২০০৭ : ৩১২-৩১৩)

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন দলের মধ্যেও গোপনীয় ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদানপ্রদানগত কৌশল বা রীতি প্রচলিত। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডারকে এড়িয়ে গিয়ে গুপ্ত বা অপ্রচলিত ভাষার আশ্রয়ে বক্তব্য প্রকাশের প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা হয়

ছদ্মবেশী বা গোপনীয় ভাষারীতি। অনুরূপ বা সাদৃশ্যধর্মী মানসিকতাসম্পন্ন ও চলাফেরা, ওঠাবসায় অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এ ধরনের ভাষারীতির প্রচলন ঘটে। ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে 'সাঙ্কেতিক বাণী' অভিধা উল্লেখপূর্বক প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তের বয়ান দিয়েছেন। যেমন– রাজমিস্ত্রি দলের সর্দার প্যাঁকালে ও তার সঙ্গী মোনা, জনাব, আল্লারাখা, কুড়চে, গুয়েরা পারস্পরিক আলাপের একপর্যায়ে খেয়াল করে, তারা যে বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে যাচ্ছে, সেই বাড়ির মালিক অদূরে সাইকেল রেখে রাস্তার পাশেই প্রাকৃতিক কর্মসাধনে ব্যস্ত। আলাপের একপর্যায়ে তাদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হয় এবং তারাও অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ে। এ বৃত্তান্ত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে লেখক রাজমিস্ত্রিদের মধ্যে প্রচলিত গুপ্তভাষার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন নিচের বর্ণনা ও সংলাপের মাধ্যমে–

হঠাৎ ওদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'খড়গ্ পাচে।' ...অমনি সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। যে ঐ ইঙ্গিত-বাণী উচ্চারন করলে তার গা টিপে আর একজন আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় রে?' ... অদূরে সাইকেল রেখে এক ভদ্রলোক রাস্তার ধারেই একটা অপকর্ম করতে বসে গেছিলেন। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্যাঁকালে বলল, 'উ-ই যে, নীল চোঁয়ায়।' ... এদের রাজমিস্তিরিদের অনেকগুলো কোডওয়ার্ড–সাঙ্কেতিক বাণী আছে–যার মানে এরা ছাড়া অন্য কেউ বোঝে না। 'খড়গ্ পাচে' বাবু বা সায়েব আসছে বা দেখছে, আর 'নীল চোঁয়ায়' ব্যবহৃত হয় ঐ অপকর্মটির গূঢ় অর্থে। (ইসলাম, ২০০৭ : ৩১৩)

৩.৬ *লোকভাষাশ্রিত লোকসাহিত্য*

লোকসাহিত্য কোনো লোকগোষ্ঠীর ভাষিক সৃষ্টিশীলতা ও নন্দনভাবনার দৃষ্টান্তস্বরূপ বিবেচিত হয়। ভাষার উপযোগিতা মূলত ভাবের আদানপ্রদানকেন্দ্রিক, যেখানে ব্যক্তির আবেগ, ভাবনা ও সংবেদনা অন্যকে প্রকাশের তাগিদ থাকে। আর তা যখন মৌখিক মাধ্যম হিসেবে অন্তর্গত সৃজনশক্তি ও কল্পনার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা, সংবেদনারাশিকে ধারণের আধার হয়ে ওঠে, তখন লোকসাহিত্য সৃষ্টি হয়। বংশপরম্পরায় প্রজন্মান্তরে বাহিত হয় বিধায় লোকভাষাশ্রিত বিভিন্ন লোকসাহিত্যে সময়, সমাজ ও লোকগোষ্ঠীর আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, স্বকীয়তা ও সৃষ্টিশীলতা বজায় থাকে। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসেও এর রূপায়ণ ঘটেছে।

৩.৭ *ছড়া ও মেয়েলি বুলি*

মেয়েলি সংলাপে ছড়া বা এর অংশবিশেষ, বুলি প্রভৃতি উদ্ধৃত করে প্রতিপক্ষকে ব্যঙ্গ বা কটুক্তি করার নমুনা লোকসমাজের নারীদের বিশেষ প্রবণতা। পারস্পরিক আলাপ, গালগল্প, কোন্দলের অংশ হিসেবে অন্যদের কাবু করতে এর প্রয়োগ ঘটে থাকে সংলাপে। যেমন–

পুঁটের মাও খেরেস্তান, তার আর সইল না। সে তার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ম করে বলে উঠল, 'আ-সইরন সইতে নারি, সিকেয় ইয়ে দিয়ে ঝুলে মরি।' (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৫)

ছেলেমেয়েরা 'বৌ পালানো' খেলায় যে ছড়া কাটে, তাতে রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজভুক্ত একান্নবর্তী পরিবারের নিপীড়নমূলক সামাজিক চালচিত্র প্রতিবিম্বিত হলেও লোকমানসে এর সহজাত আবেদন দ্যোতিত হয় লোকক্রীড়ার অনুষঙ্গে। বিশেষত, খেলার নিয়ম হিসেবেই ছড়ার সঙ্গে সংযোগ সাধিত হয় বালক-বালিকাদের মনস্তত্ত্বে–

'বৌ পালালো বৌ পালালো ক্ষুদের হাঁড়ি নিয়ে, সে বৌকে আনতে যাব মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে।' (ইসলাম, ২০০৭: ৩১৭)

সেজো-বৌর অসুস্থ নবজাতক খোকাকে ঘুম পাড়ানি ছড়া শুনিয়ে মেজো-বৌ ঘুম পাড়ায়। এতে প্রকাশিত হয় ভূমিসংলগ্ন কৃষক পরিবারের পরিবারের বর-কনের দাম্পত্যমধুর সম্পর্কের চালচিত্র–

যাদু আমার লাঙল চষে, দুধারে তার কাল গরু,

যাদুর বেছে বেছে বিয়ে দিব পেট মোটা মাজা সরু। (ইসলাম, ২০০৭: ৩২২)

মেজো-বৌ অসুস্থ খোকাকে কোলে নিয়ে দোল দিয়ে ঘুম পাড়ানি ছড়া আবৃত্তি করে–'ঘুম আয়রে নাইলোতলা দিয়া, ছাগল-চোরায় যুক্তি করে খোকনের ঘুম নিয়া।' (ইসলাম, ২০০৭: ৩৪১)

মৌখিক বুলিও লোকসমাজে প্রচলিত থাকে, যা কুশীলবদের আলাপেরই অংশবিশেষ। মেজো-বৌ তার দুলাভাইকে বিয়ে করবে, এমন গুজব শুনে তার শাশুড়ি প্যাঁকালের মা ক্ষিপ্ত হলে তাকে সংযত করতে বড়-বৌ তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করে–

আচ্ছা মা, তোমার কি কিছুই আক্কেল হুঁশ নেই? 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।' (ইসলাম, ২০০৭: ৩২৩)

বিপদের সম্ভাবনা, শঙ্কা, অমঙ্গল এড়াতে বিশেষ ধরনের মেয়েলি বুলির প্রয়োগ সংলাপে লক্ষণীয়। প্যাঁকালে তার মেজো-ভাবীর সঙ্গে নিকা করার প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় তার ভাতিজা ভাবে, সে হয়ত তার মৃত বাবার কাছে চলে গেছে। শিশুর মনে জেগে ওঠা এমন সরল ভাবনা জেনে মেজো-বৌ ভীত হয়। কারণ মৃত মানুষের সঙ্গে সংযোগের ব্যাপারটি লোকসমাজে বিপদের ইঙ্গিতবহ বিবেচিত হয়, কোনো অনিষ্ট ঘটবার আশংকায়।

মেজো-বৌয়ের আনমনা ছেলেটি আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ... মাকে বলে, ' আচ্ছা মা, ছোট-চা বুঝি বা-জানের কাছে চলে গিয়েছে? উখেনে থেকে বুঝি আর ছেড়ে দেয় না?' ...

মা ছেলেকে বুকে চেপে ধরে। বলে, 'বালাই! ষাট! উখেনে যাবে কেন?' (ইসলাম, ২০০৭: ৩৩৫)

লতিফা নাজির সাহেবের গায়ে ... কটাস করে রাম-চিমটি কেটে বলে, 'ষাট! বালাই! তোমায় কে মোটা বলে! (ইসলাম, ২০০৭: ৩৮৯)

৩.৮ লোকসঙ্গীত

লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমানুষঙ্গ বিষয়ক গানের কলি গেয়ে প্যাঁকালে তার প্রেমিকা কুর্শিকে কাছে ডাকে। 'ওমান কাতলি' পাড়ার ভেতর দিয়ে যাবার সময় নির্দিষ্ট একটি ঘরের সামনে হাজির হয়ে প্যাঁকালে গান ধরে 'কালো শশী রে, বিরহ-জ্বালায় মরি!' কুর্শি এ গান শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেও তাদের আলাপ জমে ওঠার সুযোগ হয়নি প্যাঁকালের সঙ্গীদের উপস্থিতিতে। তখন নাটকীয়ভাবেই সেই রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলা জনৈক গাড়োয়ান তাদেরকে দেখে ইঙ্গিতসূচক গান গেয়ে ওঠে 'ছোঁড়ার মাথায় বাবরি-কাটা চুল,/হায় ছুঁড়িরা মজাইল কূল!' (ইসলাম, ২০০৭: ৩১২) তার কর্কশ কণ্ঠের গান এ দুই প্রণয়ীর ভাবোচ্ছ্বাসে রসভঙ্গ ঘটিয়ে দেয়। মেজো-বৌ জীবনরসিক নারী, পারিপার্শ্বিক বিবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও যে মানবিক আচরণ, দায়িত্বশীল মনোভাব ও সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের গুণে পরিবারে, এমনকি সমাজেও আত্মসম্মান বজায় রাখতে সমর্থ। আবার মনের খেয়ালে সে গুনগুন করে গান গায়। বিধবা হলেও রূপবতী এ নারীর রূপের প্রতি সমাজের বহু পুরুষের অযাচিত কৌতূহল লক্ষণীয়। তবে সে এ ব্যাপারে অনাগ্রহী এবং দুই সন্তানের মা হিসেবেই পরিবারের দায়িত্ব পালনে মনোযোগী। স্বামীহারা এ নারীর অন্তরের আর্তি ও আক্ষেপ ফুটে ওঠে নিজমনে গেয়ে চলা সঙ্গীতে, যেখানে প্রিয়তমকে হারানোর বেদনাই প্রবল হয়ে ওঠে। রাধার বিলাপ কৃষ্ণকে না পাবার বেদনায় লোকসঙ্গীতে যেভাবে প্রকাশিত হয়, মেজো-বৌর হৃদয়াবেগও এ সঙ্গীতের আধারে যেন সেভাবেই বিলাপের প্রতিধ্বনি জাগায়– 'কত আশা করে সাগর সেঁচিলাম/মানিক পাবার আশে,/শেষে সাগর শুকাল মানিক লুঁকাল/অভাগিনীর কপাল-দোষে। ... নিঠুর কালার নাম করো না,/ কালার নাম করিলে প্রাণ কাঁদিবে/কালায় পড়িবে মনে গো!/নিঠুর কালার নাম করো না!' (ইসলাম, ২০০৭: ৩২১)

৩.৯. লোকভাষাশ্রিত সাংস্কৃতিক উপাদান

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান লোকভাষার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়। এগুলো সরাসরি লোকসাহিত্য নয়, তবে লোকগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে ধারণের প্রবণতা এসব উপাদানে লক্ষণীয়। সামাজিক প্রবাহের সঙ্গে কালিক পরিবর্তনের সমন্বয়

সাধনের মাধ্যমে অভিযোজিতরূপে টিকে থাকা লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ধর্ম-পুরাণ, ইতিহাস, কিংবদন্তি, লোকজ উপাদানসমূহের বিস্তার প্রায়শ মৌখিকভাবে ঘটে এবং বংশপরম্পরায় রক্ষিত হয়। লোকভাষাও এসব উপাদান সংরক্ষণের আধার হিসেবে বিবেচিত হয়। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে কৃষ্ণনগরের কায়িক শ্রমজীবী লোকগোষ্ঠীর পরিমণ্ডলে চর্চিত লোকভাষাতেও এসব উপাদানের কিছু নমুনা লক্ষণীয়।

৩.৯.১. *লোকসম্ভাষণ*

ব্যক্তির আচরণ ও মনস্তত্ত্ব, স্বভাবগত প্রবণতা ও মুদ্রাদোষ, অভ্যাস ও অঙ্গভঙ্গি, বাচিক বিন্যাস প্রভৃতির কারণে লৌকিক সম্ভাষণ বা সম্বোধনের প্রয়োগ লোকসমাজের প্রচলিত রীতি। তার চরিত্রে প্রতিফলিত সদর্থক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের প্রবণতাই লোকসমাজের নিরিখে দৃষ্টান্ত বা প্রতিনিধিত্ব বিবেচনায় মান্যতা পায়। এক্ষেত্রে তার ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ, ব্যক্তির স্বকীয় প্রবণতা, গুণ-দোষ, অভ্যাস, দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলি-আকার ও দেহবর্ণ এমনকি তার বাচিক ভঙ্গি ও মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব লোকসমাজের কাছে পৃথক মনোযোগ পেয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে নিজস্ব নামটির পরিবর্তে লোকসমাজের কারো প্রদত্ত বা আরোপিত নাম বা সম্বোধনও ক্ষেত্রবিশেষে তার ব্যক্তিত্বের বিশেষ দিককে ইঙ্গিতবহ করে, এমনকি তার মানসিকতা ও স্বভাবের প্রতিফলন ঘটায়। যেমন, এ উপন্যাসের 'গজালের মা', যে বিধবা, তিন ছেলেকে হারিয়ে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের কর্ত্রী হিসেবে অবিবাহিত এক ছেলে, তিন পুত্রবধূ, বিবাহিতা এক মেয়ে ও কয়েকজন নাতি-নাতনিকে নিয়ে দিনযাপনের ব্যতিব্যস্ততায় নিত্যদিন পর্যুদস্ত থাকে। তার স্বভাবে খিটখিটে আচরণ, বদমেজাজ, অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধাত্মক অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ অন্যদেরকে পীড়িত করে। অথচ তার প্রতি সমব্যথী হয়ে উদার আচরণে কেউ তৎপর নয়। এমতাবস্থায় প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার আচরণে উগ্রতা, কলহপ্রবণতা ও মারমুখী আচরণ লক্ষণীয়। ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান এ বৃদ্ধাকে পাড়ার নারীরা 'কুঁদুলি' (অর্থাৎ কোন্দল বা কলহে পটু) হিসেবে সম্বোধন করে। লেখক সেই নারীর নিজস্ব নামটি উপন্যাসে উল্লেখের পরিবর্তে তার বড় ছেলে 'গজাল' এর নামেই 'গজালের মা' সম্বোধনে তাকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এ আচরণ ও মনস্তত্ত্বের অন্তরালে রয়েছে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের সূক্ষ্ম-সচেতন অভিপ্রায়। লেখক এ বৃদ্ধা নারীর প্রসঙ্গে যে বয়ান উপস্থাপন করেছেন, এতে তার মানসিক গড়ন ও স্বভাবগত প্রবণতা অনেকটাই আভাসিত। বিশেষত প্রতিপক্ষ খ্রিষ্টান প্রতিবেশী 'হিড়িম্বা'র (লেখকের মতে, যে দেখতে 'একেবারে সেকালের ভীম-কান্তা হিড়িম্বা দেবী'র মতোই সঙ্গে মারমুখী আচরণে, এমনকি অকথ্য ভাষায় তাকে পর্যুদস্ত করতে যে গজালের মা পারদর্শী, লেখক সেই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন–

গজালের মা-র পাড়াতে কুঁদুলি বলে বেশ নামডাক আছে। ... সে-ই 'অপোজিশন লীড' করছে মুসলমান তরফ থেকে। ... গজালের মা গজালের মতোই সরু–হাড্ডি-চামড়া সার কিন্তু তার কথাগুলো বুকে বেঁধে গজালের মতোই নির্মম হয়ে। গজাল উঠিয়ে ফেললেও দেয়ালে তার দাগ যেমন অক্ষয় হয়ে যায়, ঝগড়া থেমে গেলেও গজালের মা-র কটূক্তির জ্বালা তেমনি কিছুতেই আর মিটতে চায় না। (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৪)

পাড়ার নারীদের কলসি কাঁখে জল আনতে গিয়ে ধর্মীয় পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে কলহে মেতে ওঠা ও অন্যের প্রতি অপকর্মের দায় চাপিয়ে তাকে অপদস্থ করার প্রবণতাও লক্ষণীয়। গজালের মায়ের বড় ছেলে গজাল মহল্লার বাসিন্দা খ্রিষ্টান ইংরেজ 'জজ সায়েব'-এর বাসায় রান্নার কাজ অর্থাৎ বাবুর্চি হিসেবে কর্মরত ছিল। এমনকি গজাল যখন অসুস্থ ছিল, তখন তার মাকেই এ কাজ করতে হয়েছিল। তাই বিধর্মীর বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করার দায়ে হিড়িম্বা তাকে যেমন অপমানিত করে, তেমনিভাবে 'উঝড়োখাগী', 'ভাতারপুতখাগি', 'তিন বেটাখাগি' প্রভৃতি সম্ভাষণে গালিগালাজ করে। এর জবাবে গজালের মাও হিড়িম্বাকে 'হুতমোচোখি' সম্বোধনপূর্বক তার বিরুদ্ধে চাল চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে প্রহৃত হবার অভিযোগ খণ্ডন করে। এমনকি সে বা তার ছেলে যে বিদেশি, বিভাষী আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয়, সে ব্যাপারেও পাল্টা জবাব দেয়।

কৃষ্ণনগরের বাসিন্দাদের পারস্পরিক আলাপে সম্বোধনের বিশেষ রীতি প্রচলিত। ব্যক্তির পাশাপাশি স্রষ্টার প্রতিও এ সম্বোধনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মানত করা বা প্রার্থিত ইচ্ছা, প্রত্যাশা পূরণের জন্য এ ধরনের সম্বোধনে মেয়েলি বুলির আন্তরিকতা প্রকাশিত হয়। যেমন– গজালের ভাই প্যাঁকালে, যে টাউনের থিয়েটারদলে নাচে, সখী সাজে, গান গায় এবং রাজমিস্ত্রির কাজ করে পরিবারের ব্যয়বার মেটায়, তার প্রতি পাড়ার বৌ-ঝিদের নজর পড়ে। কারণ তার স্বভাবে রয়েছে বাবুসুলভ অনুকরণবৃত্তি। বাবুদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে সেও 'টেড়ি কাটে, 'ছিকরেট' টানে, পান খায়, চা খায়।' (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৭) তাই সে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে কাজে যেতে যেতে গান গায়, তখন তার দিকে পাড়ার বৌ-ঝিরা ঘোমটা তুলে তাকায়। 'ভাবী' সম্পর্কের জেরে কেউ বা তার দিকে তাকিয়ে হাসে।

অবিবাহিতা মেয়ের মায়েরা আল্লা মিঞাকে জোড়া মোরগের গোশতের লোভ দেখিয়ে বলে, 'হেই আল্লাজি, আমার কুড়ুনির সাথেই ওর জোড়া লিখো।' (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৭)

সম্বোধনের ক্ষেত্রে পুরুষের ভিন্ন প্রয়োগ কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক বাসিন্দাদের আচরণে লক্ষণীয়। বিশেষত চরিত্রের ক্রোধ, বিরক্তি বা সংযমহীনতার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাসূচক 'আপনি'

বা 'প্রিয়জনের প্রতি 'তুমি' সম্বোধনের পরিবর্তে খানিকটা হেয় করতে বা অশ্রদ্ধা প্রকাশে 'তুই' সম্বোধনের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সন্তানসম্ভবা বোন পাঁচি স্বামীর দ্বিতীয়বার বিয়ের ঘটনায় অভিমানবশত বাপের বাড়িতে চলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার মার প্রতি ছেলে প্যাঁকালের রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারণ দাই হিড়িম্বার সঙ্গে জল আনতে গিয়ে কলহ করায় এখন প্যাঁকালের পক্ষে তাকে ডেকে এনে বোনের অসুস্থতার প্রতিকার করানোর বন্দোবস্ত আত্মসম্মানে আঘাতের নামান্তর। এ পর্যায়ে প্যাঁকালে ও তার মায়ের সংলাপ–

ছেলের ওপর অভিমান করে কিছুই বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু আর সে থাকতে পারল না। ছেলের কাছে এসে কেঁদে পড়ল, 'ওরে, পাঁচি যে আর বাঁচে না।' ... চা খেয়ে এসেও প্যাঁকালের উষ্মা তখনও কাটেনি। সে টেড়ি কাটতে কাটতে মুখ না তুলেই বলল, 'মরুক! আমি তার কি করব? দাইয়ের টাকা দিতে পারবি?' ... 'রোজ ঝগড়া করবি নুলোর মা-র (হিড়িম্বা) সঙ্গে' (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৮)

পারস্পরিক সম্পর্কের আন্তরিকতাহেতু ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্বোধনের ভিন্ন প্রয়োগও নদীয়া-কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক নারীদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। যেমন–

গজালের মা ... দৌড়ে হিড়িম্বার হাত দুটো ধরে বলল, 'নুলোর মা, আমায় মাফ কর ভাই! একটু দৌড়ে আয়, আমার পাঁচি আর বাঁচে না!' ... হিড়িম্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'অ! তা তোর পাঁচির ছেলে হবে বুঝি? তা আত (রাত) থেকে কষ্ট পাচ্ছে– আর আমায় খবর পাঠাসনি? আচ্ছা মা যাহোক বাবা তুই! (রফিকুল, ২০০৭ : পৃ. ৩০৯)

মেজো-বৌ চাল-ডাল তুলতে তুলতে (সেজো-বৌকে) বলল, 'ভালো হয়ে ওঠ্ ভাই আল্লা করে' (রফিকুল, ২০০৭ : ৩১৮)

ঘিয়াসুদ্দিন কী বলতে কী বলে ফেলে। খেই হারিয়ে যায় কথার। বলে, 'আচ্ছা ভাই, তুমি মাথায় না-ই চড়লে, পিঠে চড়তে রাজি তো?' (রফিকুল, ২০০৭ : ৩২৭)

প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'ভাই' শব্দের প্রয়োগ বক্তা ও শ্রোতার সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়, বরং পরিস্থিতিগত কারণে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী প্রযুক্ত। তৃতীয় দৃষ্টান্তে শ্যালিকা মেজো-বৌকে দুলাভাই ঘিয়াসুদ্দিনের 'ভাই' সম্বোধন সম্পর্কের রীতি মেনে ঘটেনি। বরং নদীয়া-কৃষ্ণনগরের কথোপকথনের রীতি মেনে প্রকাশিত। এ রীতি কলকাতার বাসিন্দা ঘিয়াসুদ্দিনের আচরণেও প্রভাব বিস্তার করেছে।

৩.৯.২. *ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনী*

লোকসমাজের বাসিন্দাদের সমষ্টিচেতনায় সন্নিহিত বিভিন্ন ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ও প্রসঙ্গের আলোকে প্রকাশিত হয় মানবমনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক। এক্ষেত্রে তার দৈহিক গড়ন ও বর্ণ, স্বভাবগত প্রবণতা ও অঙ্গভঙ্গিমা প্রভৃতিকে ধারণ করে বিভিন্ন লৌকিক-পৌরাণিক ভাবপরিমণ্ডল। এসব নৃতাত্ত্বিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানের

প্রভাব যে বংশপরম্পায় প্রজন্মান্তরে সংরক্ষিত থাকে, নজরুল এ উপন্যাসে সে প্রসঙ্গটিকে উপস্থাপন করেছেন। যেমন– এ উপন্যাসের ‘এক’ পরিচ্ছেদে পাড়ার নারীরা কলসি কাঁখে জল আনতে গিয়ে ধর্মীয় পরিচয়কেন্দ্রিক বিভাজনের পরিণতিতে কলহে লিপ্ত হয়। মুসলমান বৃদ্ধা গজালের মার বাকশূলে আহত সনাতন ধর্মাবলম্বী হিড়িম্বা তাকে থামাতে পাল্টা অভিযোগ জানায়। তার সম্পর্কে লেখকের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে হিড়িম্বা রাক্ষুসীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পৌরাণিক বর্ণনা ও বৃত্তান্তসূচক ভাবপরিমণ্ডল–

অপরপক্ষে হিড়িম্বাও হটবার পাত্রী নয়। তার ভাষা ... তার শরীর এবং স্বর এ দুটোর তুলনা মেলে না! একেবারে সেকালের ভীম-কান্তা হিড়িম্বা দেবীর মতোই। ... গজালের মাকে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পেতলের কলসিটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অঙ্গ দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মতো মুখ বিকৃত করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, ... এইবার হিড়িম্বা ফস করে তার চুল খুলে দিয়ে একেবারে ‘এলোকেশী বামা’ হয়ে দাঁড়ালো এবং কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে খাতুনের মার মুখের সামনে হাত দুটো বারকয়েক বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠল ... সে কেলেঙ্কারির কথাটা এতগুলো মেয়ের মধ্যে ঘোষণা করে দেওয়াতে সে এইবার যা কাণ্ড করতে লাগল–তা অবর্ণনীয়। চুল ছিঁড়ে, আঙুল মটকে, চেঁচিয়ে, কেঁদে, নেচে, কুঁদে সে যেন একটা বিরাট ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে ফেলল। (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৪-৩০৬)

অনুরূপ বৃত্তান্ত হিড়িম্বার প্রতিপক্ষ গজালের মায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গজালের মতই হ্যাংলা গড়নের অথচ বাক্যবাণে প্রতিপক্ষকে কাবু করতে চৌকষ এ বৃদ্ধা নারীর বুদ্ধিমত্তা ও ধারালো সংলাপে হিড়িম্বা কুপোকাত হয়ে যায়। হিড়িম্বার সঙ্গে তার লড়াইয়ের খবর পাড়ার বাসিন্দাদের মুখরোচক আলাপ, এমনকি বালক-বালিকাদের কাছেও আমোদের ব্যাপার হয়ে ওঠে। ফলে, একপর্যায়ে চাঁদসড়কের চাঁদবাজার এলাকার জল আনতে সমবেত কয়েকজন প্রতিবেশী নারী কোন্দল হয়ে ওঠে সেখানকার বাসিন্দাদের জমজমাট রম্যরসের আধার। ভৈরবী বা কালী দেবীর হিংস্র, ভয়ংকরী, দিগম্বরী চণ্ডী রূপটিকে নিচের সংলাপগুলোতে আভাসিত করা হয়েছে, যা জনমনস্তত্ত্বে সন্নিহিত ছিল এবং এসব সংলাপে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লোকভাষায় এভাবেই প্রাচীন প্রত্ন-প্রতিমার অস্তিত্ব প্রজন্মান্তরে বহমান থাকে সমকালীন জীবনবাস্তবতার বিভিন্ন অনুষঙ্গকে আশ্রয় করে, যা লোকসমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন দল, গোত্র এবং সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকেও সামনে নিয়ে আসে।

গয়লাপাড়ার একটি হিন্দু ছেলে তার খেলার সঙ্গী পচাকে ডেকে বলে, ‘ওরে পচা রে, উই শালা পচা! ছুটে আয় রে ছুটে আয়। তোর দিদিমা ‘মা-কালি’ হয়ে গিয়েছে।’ ... মুসলমান তরফের একটি বৌ আর থাকতে না পেরে ঘোমটার ভিতর তেকেই বলে উঠল, ‘হাতে একখানা খাড়া দিলেই হয়!’ ... তার চেয়েও সুরসিকা একটি আধ-বয়েসী মেয়ে

পিছন থেকে বলে উঠল, ‘কাপড়টাও খুলে পড়তে আর বাকি নেই লো!’ (ইসলাম, ২০০৭ : ৩০৬)

মনসামঙ্গল কাব্যের ‘বেহুলা লখীন্দর কাহিনী’র প্রভাব যে লোকসমাজে প্রচলিত, মুসলমান বৃদ্ধা প্যাঁকালের মার অভিশাপবাণীতে তা প্রকাশিত। বিধবা মেজো-বৌ তার দুলাভাইকে নিকা করবে, এমন গুজব শুনে তার শাশুড়ি ক্রোধান্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দেয়–

আমার জোয়ান-পুত খাগি। আমার বেটার মাথা খেয়ে এখন চললি নিকে করতে!–ভাল হবে না লো, ভাল হবে না। এই আমি বলে রাখছি, বিয়ের রাতেই জাত-সাপে খাবে তোদের দুই জনকেই।’ (ইসলাম, ২০০৭ : ৩২২)

এছাড়া হিন্দু ধর্মের একাধিক অনুষঙ্গ সাংস্কৃতিক উপাদানের আদানপ্রদানের গুণে মুসলমানের মনোভাবনাতেও যে সন্নিহিত থাকে, এর একাধিক দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। ইসলাম ধর্মে ‘আজরাইল’ হল প্রাণহরণকারী ফেরেশতা। হিন্দু ধর্মে ‘যম’ একই দায়িত্বে নিয়োজিত। সেজো-বৌ মৃত্যুকালে মেজো-বৌকে বলেছিল, তার মৃত স্বামী স্বপ্নে দেখা দিয়েছে। সে নাকি তার নবজাতক খোকাকে নিতে এসেছে। তার ধারণা, সেও অচিরেই মৃত্যুবরণ করবে। আলাপকালে সে মেজো-বৌকে জানিয়েছিল যে খোকার বাবা তার অনুনয় প্রত্যাখ্যান করলে সে বলেছিল, ‘যম তো নেবে, তুমি (স্বামী) না নাও।’ (ইসলাম, ২০০৭: ৩৪০) অন্যদিকে ইসলামী অনুষঙ্গ বা এ সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব ঈদ সম্পর্কে প্যাঁকালের পরিবারের বালক-বালিকাদের উৎসবপ্রীতি সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন ‘দুই’ পরিচ্ছেদে, যেখানে পাঁচি গর্ভস্থ সন্তান কোলে নিয়ে প্রসবের পরিশ্রমক্লিষ্ট সাফল্যে আনন্দিত। তাদেরকে দেখে বালক-বালিকাদের অভিব্যক্তি– ‘ওদের খুশি যেন আর ধরে না। ওরা যেন ঈদের চাঁদ দেখেছে।’ (ইসলাম, ২০০৭ : ৩১০) তাদের এ উৎফুল্লতা সম্প্রসারিত হয় পাড়ার খ্রিস্টান ছেলেদের অনুসরণে মুসলমান ছেলেদের সমগীতে– ‘আমরা যিশুর গান গাই।’ (ইসলাম, ২০০৭ : ৩১০) মাতা মেরির গর্ভে বেথেলহেমের এক দরিদ্র কুটিরে ঈশ্বরপুত্র যিশুর আগমনের সঙ্গে দরিদ্রক্লিষ্ট পরিবারের আটপৌরে চালাঘরে পাঁচির কোলে তার নবজাতকের আগমন মানবতা ও আনন্দের সাঙ্গীকরণে অসাম্প্রদায়িক আবেদনকে বহুগুণে সম্প্রসারিত করে।

৩.৯.৩. *শপথ ও প্রতিশ্রুতি*

দিব্যি দেয়া, কিরা কাটা, শপথ করা প্রভৃতি লোকসংস্কারের প্রভাব ক্ষেত্রবিশেষে চরিত্রের সংলাপে লক্ষণীয়, যেখানে ব্যক্তির আবেগ, বিশ্বাস ও মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে অবলীলায়। শপথ ভঙ্গ করলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়াজনিত ভীতি ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে তা মান্য করতে। বিধবা মেজো-বৌ সম্পর্কে প্যাঁকালের বড় ভাবী। তাদের নিকা সম্পর্কে অচিরেই পাড়ায় গুজব রটে। এর প্রতিক্রিয়ায় প্যাঁকালের প্রণয়িণী

কুর্শির মনে অভিমান জেগে ওঠে। তার মান ভাঙাতে প্যাঁকালের প্রচেষ্টা প্রকাশিত হয় নিচের সংলাপে–

'আল্লার কিরে কুর্শি, খোদার কসম, আমি ও নিকে করছিনে। আমাকে কয়েছিল মা, তা আমি আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছি মুখের মতন। ... কুর্শি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'যা মাইরি, এখুনি কেউ দেখে ফেলবে। ... প্যাঁকালে সাহস পেয়ে বলে, 'এই দেখ্ মজিদের দিকে মুখ করে বলছি, আল্লার কিরে কুর্শি, আমি যাব না কোথাও তুই না বললে।' ... কুর্শি খুশি হয়ে বলে, 'উহু! আমার গা ছুঁয়ে বল্।' (ইসলাম, ২০০৭: ৩৩৩-৩৩৪)

৪. পর্যালোচনা

বিস্তৃত পরিসরে আমরা *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে লোকভাষার প্রায়োগিক দিকগুলোর প্রতি আলোকপাত করেছি। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে আহৃত বাস্তবজীবনের ভাষিক উপাদানসমূহ নয়, বরং এ উপন্যাসে নজরুলের প্রযুক্ত সংলাপ রচনা ও ভাব-বিনিময়ভিত্তিক অন্যান্য উপাদানসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক প্রায় একশ বছর পূর্ববর্তী কৃষ্ণনগরের লোকভাষার স্বরূপ ও প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করা সম্ভব। ভাষা সতত প্রবহমান বিধায় এর পরিবর্তনীয়তাও দ্রুতগামী ও গতিশীল। বর্তমান উপন্যাসে নজরুলের সাহিত্যিক প্রতিভার নির্যাস ও সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কুশীলবদের ব্যবহৃত সংলাপ, বাকভঙ্গিমা, লোকসম্ভাষণ, লোকসাহিত্য, দেহভঙ্গিমা ও ইশারা ভাষা, গুপ্ত ভাষা প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা লোকভাষিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত হওয়া যায়। বর্তমানে কৃষ্ণনগর অঞ্চলের প্রচলিত লোকভাষার সঙ্গে এ উপন্যাসে প্রযুক্ত লোকভাষার প্রতিতুলনার মাধ্যমে এ জনপদের ভাষিক পরিবর্তনশীলতা ও নগরায়ণের হালহকিকত সম্পর্কে নতুন ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তবে, সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম হিসেবে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের লোকভাষার বিশিষ্টতা একারণেও অনস্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্যে ইতঃপূর্বে গ্রামভিত্তিক লোকভাষার প্রয়োগ বিভিন্ন উপন্যাসে পাওয়া গেলেও শহর-নগর-মহানগরকেন্দ্রিক, বিশেষত কৃষ্ণনগরের মতো মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যবাহী নগরের প্রান্তিক লোকগোষ্ঠীর প্রযুক্ত লোকভাষা ও লোকসংস্কৃতিভিত্তিক উপন্যাসের নমুনা অকল্পনীয় ও অদৃষ্টপূর্ব। এদিক থেকে নজরুল বিরল কৃতিত্বের অধিকারী। গণমানুষের প্রতি তাঁর সারাজীবনের গভীর দরদ-সহমর্মিতা ও একাত্মবোধই এ উপন্যাস রচনার মৌল অনুপ্রেরণা। এর প্রতিফলন উপন্যাসটির দরিদ্র-অবহেলিত-সংগ্রামশীল কুশীলবদের প্রযুক্ত লোকভাষায় বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

৫. উপসংহার

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে ইংরেজশাসিত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক জনপদের চালচিত্র গ্রন্থনায় নজরুল নৈপুণ্যের সঙ্গে স্থানীয় উপনিবেশিত প্রান্তিক, লোকসমাজভুক্ত বাসিন্দাদের ভাষিক পরিমণ্ডলটিকে সামগ্রিকভাবে ধারণে যথাসম্ভব সচেষ্ট থেকেছেন। বাঙালি মুসলমান, স্বল্প সংখ্যক হিন্দু ও ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের পাশাপাশি বিভিন্ন অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গড়ে ওঠা চাঁদ-সড়ক এলাকার বৃত্তান্তকে উপস্থাপনে তিনি কুশীলবদের অবলম্বিত লোকভাষাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ উপন্যাসে নজরুল কথাসাহিত্যের পূর্বধারা থেকে সরে এসে গদ্যরীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। বিশেষত, নিম্নবর্গের লোকগোষ্ঠীর অনুসৃত মুখের ভাষাকে তিনি ব্যবহার করেছেন বর্ণনা ও সংলাপ নির্মাণে, যা উপন্যাসটির বক্তব্যকে স্পষ্ট, জোরালো করেছে। এ প্রবন্ধে বিভিন্ন মানদণ্ডের আলোকে উপন্যাসটির ভাষিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিসরে মূল্যায়নের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কারণ বিষয়গত বিবেচনায় উপন্যাসটি বোদ্ধাজনের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হলেও এর লোকভাষিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সমালোচকমহলে নীরবতা পরিলক্ষিত হয়। নজরুলের কালজয়ী সাহিত্যকর্ম হিসেবে উপন্যাসটির একাধিক নতুন পাঠ আগামীতে আরও সম্প্রসারিত হবে, এমনটিই আমাদের প্রত্যাশা।

অন্ত্যটীকা

১. "মৃত্যুক্ষুধা' ১৩৩৭ বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উহা ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে ১৩৩৬ ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত সওগাতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।" (উদ্ধৃত, ইসলাম, ২০০৭ : ৪৫৩)

২. বাংলা কথাসাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাবের বাহন ছিল ছোটগল্প। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' (সওগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) শীর্ষক ছোটগল্প তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম। এছাড়া তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটিও হল গল্প সংকলন *ব্যথার দান*। তিনি 'আমার সুন্দর' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন–

আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তার পর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। (উদ্ধৃত, ইসলাম, ২০০৮: ৩৭)

৩. সুশীলকুমার গুপ্তের অভিমত–

'মৃত্যু-ক্ষুধা' [প্রথম প্রকাশ–ফাল্গুন ১৩৩৬ (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ)] উপন্যাসের জন্য নজরুল সৎ ঔপন্যাসিকের গৌরব সঙ্গতভাবেই কতকটা দাবি করতে পারেন। এই একটি গ্রন্থই সত্যকার উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। এই উপন্যাসেই নজরুল জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও নৈরাশ্যকে সার্থকশিল্পীর মত স্পর্শ করতে পেরেছেন। 'মৃত্যু-ক্ষুধা'র পটভূমিকা কৃষ্ণনগরে। নজরুল এক সময় কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ-সড়ক এলাকায় বাস করতেন। শ্রমজীবী খ্রীষ্টান মুসলিমেরা এই স্থানের বাসিন্দা ছিল। 'মৃত্যু-ক্ষুধা' এই পরিবেশে লেখা। উপন্যাসের সময় খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। (২০০৭: ২৭১)

৪. আজহারউদ্দীন খান জানিয়েছেন–

"মৃত্যুক্ষুধা" নজরুলের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি কিছুটা দোষ পরিহার করে এগিয়েছেন, জীবনের ছবি ও চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়েছে। "মৃত্যুক্ষুধা" কৃষ্ণনগরকে পটভূমি করে রচিত। দরিদ্র মুসলিম

রাজমিস্ত্রীদের দুঃখের জীবন, খৃষ্টান মিশনারীদের পাল্লায় পড়ে অনেকের ধর্মান্তর গ্রহণ এবং এর ফলে বহু পারিবারিক জীবনে যে দুঃখ-বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে এই গ্রন্থ সেই করুণ চিত্রের রসঘন রূপায়ণ। ... নায়ক-নায়িকাদের কণ্ঠে ভাষা দিতে গিয়ে নজরুল আঞ্চলিকতা বা তৎস্থানিকতা সৃষ্টির প্রয়োজনে গ্রাম্য উপভাষা প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু "মৃত্যুক্ষুধা"য় তাঁর উপভাষা-প্রয়োগ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থে কবির দৃষ্টি অবহেলিত জনসাধারণের জীবনধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সাক্ষাৎ পাই। (১৯৯৭: ৩০৫)

৫. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মন্তব্য–

'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল "কল্লোল"। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।' (২০০৯: ৮৪)

ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, নরওয়েজীয় এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সাহিত্যের প্রভাবে নজরুলের সমকালে কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি, উত্তরা প্রভৃতি পত্রিকাসমূহে সাহিত্যচর্চারত লেখকদের লেখায় সমাজের শিক্ষিত, অভিজাত, ভদ্র, সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মানুষদের এড়িয়ে সমাজের নিচুতলার অবহেলিত ব্রাত্য জনজীবনকে বাস্তবানুগভাবে রূপায়ণের প্রয়াস অবশ্যই তাৎপর্যবহ। নজরুলও নিঃসন্দেহে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

৬. নজরুলের সুহৃদ কমরেড মুজফ্ফর আহমদ জানিয়েছেন–

নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে একটি ভালো বাড়ী পেয়ে সেই বাড়ীতে উঠে গেল। বাড়ীটি ছিল স্টেশন রোডের ধারে। একতলা ছোট বাড়ী হলেও খুব চওড়া ছিল তার বারান্দা। পাশে আমের বাগান ছিল এবং এত বেশী খোলা ময়দান ছিল যে তাকে বাগান বাড়ীও বলা যায়। বাড়ীর মালিক ছিলেন একজন খ্রীস্টান মহিলা। ... এই জায়গাটা কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ সড়ক ইলাকা। শ্রমজীবী খ্রীস্টান ও মুসলিমদের বাস এই ইলাকায়। নজরুলের উপন্যাস "মৃত্যুক্ষুধা" এই পরিবেশেই লেখা হয়েছিল। (২০১২, পৃ. ২০৩)

৭. গবেষক রফিকুল ইসলাম এ উপন্যাসের পটভূমিকা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন–

কৃষ্ণনগরেই নজরুল তাঁর 'মৃত্যু ক্ষুধা' উপন্যাসটি রচনা করতে শুরু করেন। ... উপন্যাস রচনার পেছনে কৃষ্ণনগরে নজরুলের চাঁদ সড়ক আবাসের অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের দিকে একদিন সকাল বেলা চাঁদসড়ক বাড়ির সম্মুখস্থ আমতলায় বসে নজরুল ও সাহিত্যিক আকবর উদ্দীন বাড়ির সামনে কলে, সদর রাস্তার পাড়া ও খ্রীষ্টান পাড়ার মেয়েদের কল থেকে পানি নেয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। কে আগে পানি নেবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হত, মুসলমান ও খ্রীস্টান উভয় দলের মেয়েদের সরদারনি ছিল, ঝগড়া শুরু হলে তারা এগিয়ে আসত, 'মৃত্যুক্ষুধা'র জন্ম ওখান থেকেই। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের প্রথমাংশ কৃষ্ণনগরে এবং শেষাংশ কলকাতায় রচিত। (উদ্ধৃত, শান্তিরঞ্জন, ১৯৯২: ৪২-৪৩)

৮. সৈকত আসগর জানিয়েছেন–

রেলগার্ডের ম্যাচিয়ার, রুটির দোকানের বয়, বাসার চাকর, সৈনিক, রাজনীতির সংগঠক, লেটো দলের গায়ক, পুথি পাঠক, মুয়ায্যিন, মসজিদের ইমাম, পত্রিকা সম্পাদক, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক, গায়ক, বাদক, চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা, জেলের কয়েদী (রাজবন্দী), চলচ্চিত্রের সংলাপ রচয়িতা হিশেবে নজরুলের পরিচিতি আছে। (১৯৯০: ২৪)

৯. নজরুল অভিভাষণে জানিয়েছেন–

জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য রসের পরিবেশন করা। ... যাঁদের গ্রামের অভিজ্ঞতা আছে, তারা সেখান থেকেই তাদের সাহিত্য আরম্ভ করুন। স্থায়ী সাহিত্য চাই।

জনগণের সাথে সম্বন্ধ করতে হলে তাদের আত্মীয় হতে হবে। ... ওদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ওদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। যা বলবার বলতে হবে। [উদ্ধৃত, ইসলাম, ১৯৯৬: ১১১]

১০. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে দুটি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য: [ক. আকবরউদ্দীন, 'চাঁদসড়কে নজরুল', কল্পতরু সেনগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পা'), *কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০], [খ. অজিত দাস, *কাজী নজরুল ইসলাম: এক অজ্ঞাত পর্ব*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৫]

১১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

১২. নজরুলের সমগ্র সাহিত্যজীবনে ও সৃষ্টিশীল রচনায় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা প্রবলরূপে প্রকাশিত। কবিতা, সঙ্গীত, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় রচনাসমূহ এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর সর্বাত্মক বিরোধিতাসূচক মনোভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে, যেটির ভাবপরিমণ্ডলের সঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ–

ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লি করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ-দেশে মোড়লি করে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোচকা-পুঁটলি বেধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে। ... পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকলকিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে। (উদ্ধৃত, ইসলাম, ২০০৭ : ৪২৮)

১৩. এ তাত্ত্বিক অভিধা সম্পর্কে জানতে দ্রষ্টব্য: [গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৪]

১৪. ওয়াকিল আহমদের অভিমত–
একটি দেশের লোকসমাজ পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে জীবনযাত্রার উপযোগী যা-কিছু লাভ করে, তাই সে দেশের লোকসংস্কৃতি নামে আখ্যাত হয়ে থাকে। ... লোকসংস্কৃতিতে সমষ্টিগত মনের ছাপ বিদ্যমান; স্বতঃস্ফূর্ততা ও অকৃত্রিমতা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ... লোকসংস্কৃতি গ্রহণ-বর্জন ও রূপ-রূপান্তর গ্রহণ করে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলে এবং স্বীয় অস্তিত্ব ও গতিশীলতাকে ধরে রাখে। তাই লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্যবাহী হয়েও জীবন্ত ও চলমান। (উদ্ধৃত, আহমদ, ২০০৭: পৃ. : xiii)

১৫. লোকজ উপাদান বলতে লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত উপাদানসমূহকে বোঝায়। সংস্কৃতি বলতে মানবজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সকল প্রক্রিয়াকেই বোঝায়। অর্থাৎ লোকসমাজের বাসিন্দাদের অভ্যাস, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, মূল্যবোধ, খাদ্যাভ্যাস, পেশা, শখ, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতির সমবায়ে গড়ে ওঠা সামগ্রিক অভিব্যক্তিই লোকসংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়।

১৬. লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে লোকভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর লোকভাষা অত্যন্ত বিচিত্র, যার নেপথ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সমন্বিত অভিঘাত। লোকসমাজের ভাষাভঙ্গি নিছক বাচিক নয়। বরং অভিনয়, ইশারা, অঙ্গভঙ্গি, প্রতীক-রূপক অনুষঙ্গ, প্রবাদ-বাগধারা, বিভিন্ন ধরনের শব্দের মিশ্রণে ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও জটিল রূপ ধারণ করে। ফলে সাম্প্রতিককালে লোকবিজ্ঞানীদের মধ্যেও লোকভাষা সনাক্ত করা, এর সংজ্ঞায়ন এবং উপভাষার সঙ্গে এর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য অনুধাবনে মতভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী লোকভাষার সংজ্ঞা প্রণয়ন করেছেন, যা থেকে স্পষ্ট হয় এ প্রসঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত স্বাতন্ত্র্য–

ক. লোকভাষা থেকে আদর্শভাষা মার্জিত অভিজাত হতে হতে কৃত্রিম বা মৃত ভাষা হয়ে যায়। লোকভাষা তখন জীবন্ত ভাষা রূপে লোকমুখে মুখে বয়ে চলে। (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, উদ্ধৃত, মিলনকান্তি, ২০১৪: ১১৪)

খ. লোকভাষা হলো সামাজিক উপভাষা, যদিও লোকভাষায় আঞ্চলিক রূপভেদ থাকেই। ... লোকভাষাই হলো জীবন্ত ভাষার মূলভিত্তি, ভাষার প্রাণশক্তির মূল উৎস। লোকভাষায় একটা অপেক্ষাকৃত অমার্জিত গ্রাম্যতা থাকে, আর থাকে আঞ্চলিক রূপভেদ। (রামেশ্বর 'শ, উদ্ধৃত, সনৎকুমার, ২০০১: ৫৯)

গ. লোকভাষা কোনো বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা নয়। নাগরিক ভাষার সঙ্গে– বাংলার ক্ষেত্রে মান্য মার্জিত কলকাতার বা শহরের 'শিষ্ট' ভাষার সঙ্গে বিরোধে যে-ভাষা গ্রাম্য বলে চিহ্নিত হতে পারে তা-ই লোকভাষা। (পবিত্র সরকার, উদ্ধৃত, সনৎকুমার, ২০০১: ২৮-২৯)

পল্লব সেনগুপ্ত 'লোকভাষা'র কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ না করলেও এর সম্প্রসারিত ক্ষেত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাঁর বিবেচনায় প্রান্তীয় উপভাষা, গ্রামীণ ভাষা, মেয়েলি ভাষা, লোকসাহিত্যের ভাষা, ডাকনাম-ছদ্মনাম, শহুরে 'ককনি ও রক্নি', ছাত্রমহলের ভাষা, গালাগালির ভাষা, অপরাধ জগতের ভাষা সবকিছুই লোকভাষার অন্তর্গত। (২০১০: ৩২০)

১৭. 'নাগরিক লোকসংস্কৃতি'র ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'urban folklore'। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকসংস্কৃতিবিদ এটিকেই গ্রহণ করেছেন প্রাসঙ্গিক আলোচনাক্ষেত্রে। তবে বরুণকুমার চক্রবর্তী এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'শহুরে লোকসংস্কৃতি' অভিধা ব্যবহার করেছেন। (২০০৯: ৫৪) সৌমেন সেন এক্ষেত্রে 'City-lore' শব্দবন্ধের উল্লেখ করেছেন। (সৌগত, ২০২১, পৃ. ২০) শেখ মকবুল ইসলাম 'নগর- ফোকলোর' অভিধাটি ব্যবহারের পাশাপাশি বিকল্প যেসব অভিধার উল্লেখ করেছেন সেগুলো হল 'নগর পরিসরের ফোকলোর', 'নগরত্ব ও ফোকলোর', 'ফোকলোরের উপর নগরের প্রভাব', 'সিটি লোর' প্রভৃতি। (সৌগত, ২০২১: ৪৬)

১৮. দুজন সমালোচকের প্রাসঙ্গিক অভিমত–

'মৃত্যুক্ষুধা'ই নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ... ভাষার ওপর নজরুলের যে কত বড় অধিকার ছিল তাও দেখা যায় তার এ উপন্যাসগুলোতে। বাক্যবিন্যাসে কৃষ্ণনগরের বাগভংগী, চটুলতা এবং ইডিয়ম অনায়াসে ব্যবহার করে ভাষার প্রাণশক্তি ও ধারণ-ক্ষমতা যেমন বাড়িয়েছেন তেমনি কাব্যিক বর্ণনায় ভাষাও হয়েছে অপরূপভাবে লালিত। ... তাঁর গদ্যরীতি থেকে উপন্যাস কাহিনী অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সহজ নয়। (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৯: ৪১২-৪১৬)

১৯. সুমিতা চক্রবর্তীর মন্তব্য–

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের ভাষার ব্যবহার একটি ভিন্ন প্রবন্ধের বিষয় হয়ে যায়। বস্তির মেয়েদের ভাষা এই গঙ্গাতীরবর্তী দক্ষিণবঙ্গে কোন্ রূপ গ্রহণ করেছে–মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে, অশিক্ষিত বস্তিবাসী মেয়েদের ঝগড়ার, নালিশের, বিলাপের ভাষা কী হতে পারে–তা নজরুল যেভাবে লিপিকরণ করেছেন–দৃষ্টান্ত উদ্ধার করাই তার পরিচয় দেবার একমাত্র উপায়। ... কাজী নজরুল ইসলামের ভাষা শ্রবণের ও গ্রহণের ক্ষমতা সাধারণ মাপের ছিল না। রবীন্দ্রকাব্যভাষার সাম্রাজ্যে দাঁড়িয়ে বদলে দিয়েছিলেন তিনি। বাংলা কথ্য ভাষার প্রয়োগে এবং তৎসম, বিদেশি ও কথ্য শব্দের মিশ্রণে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতার অজস্র দৃষ্টান্ত তাঁর উপন্যাসে পাই। 'মৃত্যুক্ষুধা' এদিক দিয়ে এক রত্নপাত্র বিশেষ। ... 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসেই নজরুল পৌঁছতে পেরেছেন সেই স্তরে যাকে বাখতিন বলেছিলেন 'বহু স্বর'। এখানে মেজ বৌ ও তার দুই সন্তান–স্বতন্ত্র ও নিজ বাচনে নিজেদের প্রকাশ করে (২০০৭: ১৪৫)।

তথ্যনির্দেশ

আসগর, সৈকত (১৯৯০)। *নজরুলের গদ্যরচনা: ভাবলোক ও শিল্পরূপ*। ঢাকা : অস্ট্রিক পাবলিশার্স

দাশ, নির্মল (২০১০)। *লোকভাষা থেকে ভাষালোক*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

দাস, অজিত (১৯৯৫)। *কাজী নজরুল ইসলাম: এক অজ্ঞাত পর্ব*। কলকাতা : পুস্তক বিপণি

গুপ্ত, সুশীলকুমার (২০০৭)। *নজরুল-চরিতমানস*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

ভৌমিক, শান্তিরঞ্জন (১৯৯২)। *নজরুলের উপন্যাস*। ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার (২০০৯)। *কল্লোল যুগ*। কলকাতা : এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

সেনগুপ্ত, পল্লব (২০১০)। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সেনগুপ্ত, কল্পতরু ও অন্যান্য (সম্পাদিত) (২০০০)। *কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

আহ্‌মদ, মুজফ্‌ফর (২০১২)। *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*। কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

আহমদ, ওয়াকিল (সম্পাদিত) ২০০৭। *লোকসংস্কৃতি*। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

ইসলাম, রফিকুল ও অন্যান্য (সম্পাদিত) (২০০৮)। *নজরুল-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড)*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি

ইসলাম, কাজী নজরুল (আবদুল কাদির সম্পাদিত) (১৯৯৬)। *নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*। ঢাকা, বাংলা একাডেমি

ইসলাম, কাজী নজরুল (রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য) (সম্পাদিত) (২০০৭)। *নজরুল-রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি

ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পাদিত) (২০০৪)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

মামুদ, হায়াৎ (সম্পাদিত) (১৯৯৯)। *তোমার সাম্রাজ্যে, যুবরাজ*। ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ (সম্পাদিত) (১৯৯৯)। *নজরুল সমীক্ষণ*। ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট

রায়, নীহাররঞ্জন (১৪০৭)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

খান, আজহারউদ্দীন (১৯৯৭)। *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার (২০০৯)। *লোকসংস্কৃতির সাতকাহন*। ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন

চক্রবর্তী, সুমিতা (২০০৭)। *সৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে নজরুল*। কলকাতা : পুস্তক বিপণি

চট্টোপাধ্যায়, সৌগত (সম্পাদিত) (২০২১)। *নাগরিক লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা : লোকজ সংস্কৃতি

হুমায়ুন, রাজীব (২০২১)। *সমাজভাষাবিজ্ঞান*। ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

বিশ্বাস, মিলনকান্তি (২০১৪)। *প্রসঙ্গ : লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত) (২০০১)। *বাঙলা লোকভাষা বিজ্ঞান*। কলকাতা : লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ